

তারার নাম সূর্য

ঝর্ণা গোরলে

তারার নাম সূর্য

ঝরণা গোরলে

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারী ১৯৯০
মাঘ ১৩৯৬

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
বি. এন. শীল
ইম্প্রেসন কন্‌সালট্যান্ট
৩২/ই জয়মিত্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৫

দাম : ২০ টাকা
Rupees Twenty only.

আমার পরম আদরের তিন ভাইপো-ভাইঝি

সোনা, রাণা, মিতুন-কে

সূচি

নিবেদন

মানুষ চাঁদে পা রাখার পর থেকে গ্রহনক্ষত্র বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি শতগুণ বেড়ে গেছে। একদিকে যেমন রোবট যন্ত্রগুলি টেলিভিসন ক্যামেরার মারফৎ গ্রহ-উপগ্রহের অসাধারণ ছবি পাঠাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি যাত্রী ও যন্ত্রবাহী রকেটগুলি অনায়াসেই মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। যতই নতুন নতুন টেলিস্কোপ, রকেট আর রোবটযন্ত্র তৈরী হচ্ছে, গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে ততই আমরা নতুন খবর জানতে পারছি। তাদের সম্পর্কে আমাদের পুরোনো ধারনা বদলে যাচ্ছে—নতুন চিন্তা, নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে বিজ্ঞানের অন্যকোনো শাখায় তার নজির মেলা কঠিন। এই পরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল রাখা আরো কঠিন। যেমন কিছুকাল আগেও আমাদের ধারনা ছিল যে একমাত্র শনিগ্রহেরই বলয় আছে কিন্তু আজ ভয়েজার-এক আর ভয়েজার-দুই এই দুটি মহাকাশ অনুসন্ধানী রোবটযন্ত্রের দৌলতে বৃহস্পতি, ইউরেনাস আর নেপচুনেরও যে বলয় আছে সেকথা জানা গেছে। বৃহস্পতির উপগ্রহে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আজ ঘরে বসে টেলিভিসনে দেখা কিছুই অসম্ভব নয়। আর ভয়েজার-দুই-এর দৌলতে লোকে তাও দেখেছে। গ্রহ-উপগ্রহ আজ আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয় আর সেজন্যই সৌরজগৎকে ভালোভাবে জানা অত্যন্ত দরকার এ শুধু আমাদের জ্ঞান বাড়াবার জন্যই নয়—আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যও। সৌরজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান পৃথিবীর ভালোমন্দ বিপদ আপদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলবে।

ছোটবেলায় যখন গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে জানতে চেয়েছি হাতের কাছে দুই একটা বাংলা বই ছাড়া কিছু মেলেনি। সেগুলিও ছিল অনেককাল আগের লেখা। ফলে তথ্যের দিক থেকে খানিকটা পুরোনো। ইংরেজি বই ছিল দুর্লভ এবং দুর্বোধ্য। এ সব কথা মনে রেখেই আজকের

কিশোর-কিশোরীদের জন্য আমার এই প্রচেষ্টা। বইটিতে সৌরজগতের ওপরই বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে, আর যতটা সম্ভব জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের নতুন তথ্যগুলি সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

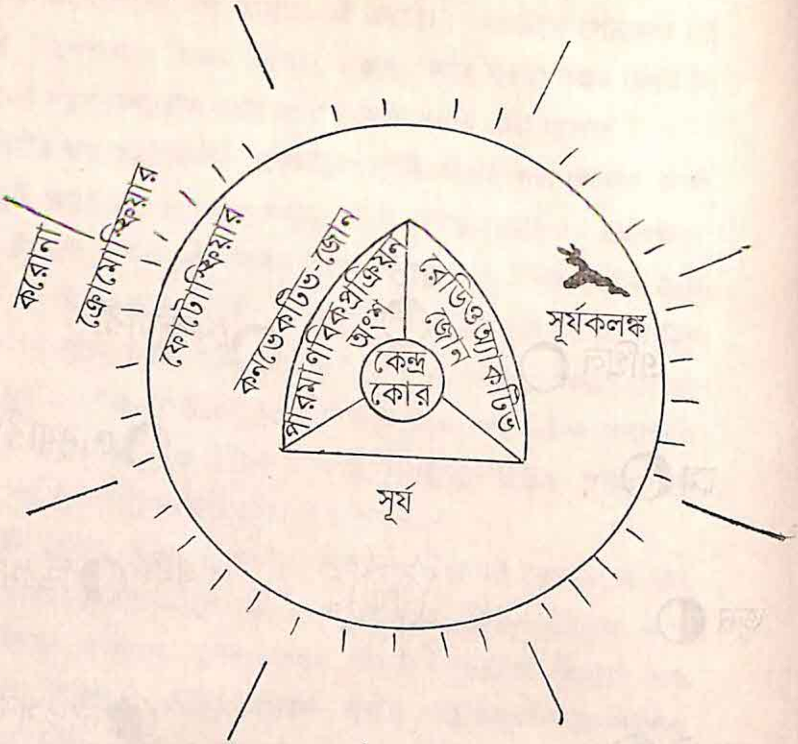
বইটির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং লেখার কাজ মোটামুটি ভাবে ১৯৮৬-১৯৮৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহ বিষয়ে এই সময়ের নতুন খবরগুলি যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করেছি। তবে ১৯১৯ সালে ভয়েজার-দুই ইউরেনাস আর নেপচুন সম্পর্কে যে নতুন খবর পাঠিয়েছে, এই গ্রন্থে তা পুরোপুরিভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রহ উপগ্রহের দূরত্ব ও আয়তনের সংখ্যাঘটিত তথ্যগুলি যথাসম্ভব কিলোমিটার ও মাইলে পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে যাতে দুই বাংলার পাঠক-পাঠিকাদেরই বুঝতে সুবিধা হয়।

বইটি লেখার ইচ্ছা বহুদিনের হলেও সে ইচ্ছাকে কোনদিনই রূপ দেওয়া সম্ভব হতো না যদি না দেশে-বিদেশে দুইজন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ তাঁদের কাজকর্ম ফেলে রেখে আমাকে অনবরত উৎসাহ আর তাগাদা না দিতেন। এঁদের একজন সুবীর রায়চৌধুরী আর অন্যজন স্টিফেন গোরলে। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

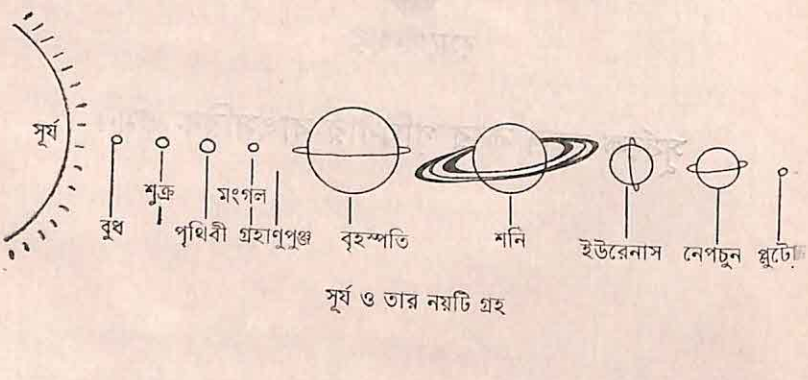
ঝরণা গোরলে



সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বাৎসরিক ভ্রমন



সূর্যের অভ্যন্তর



সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ

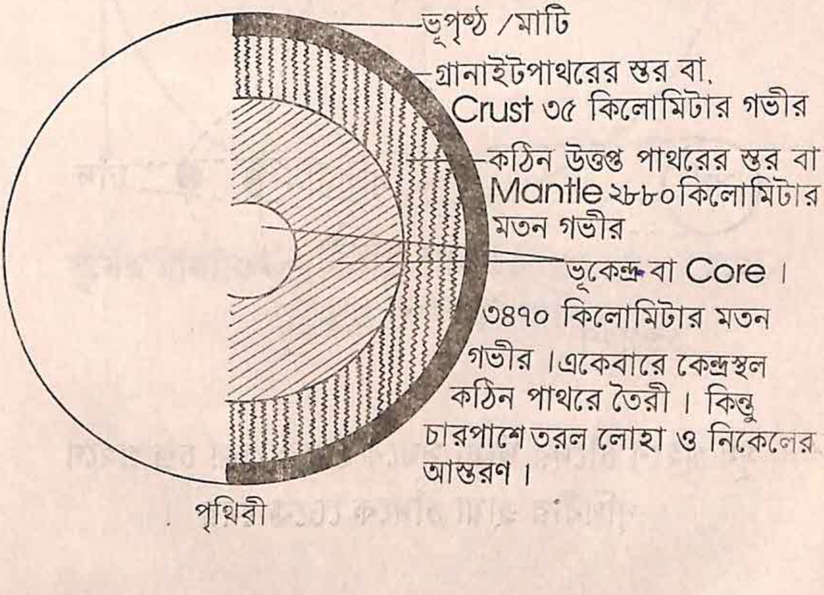


২০০ ০০০ ০০০ বছর আগে
পৃথিবীর ভূখণ্ডের চেহারা

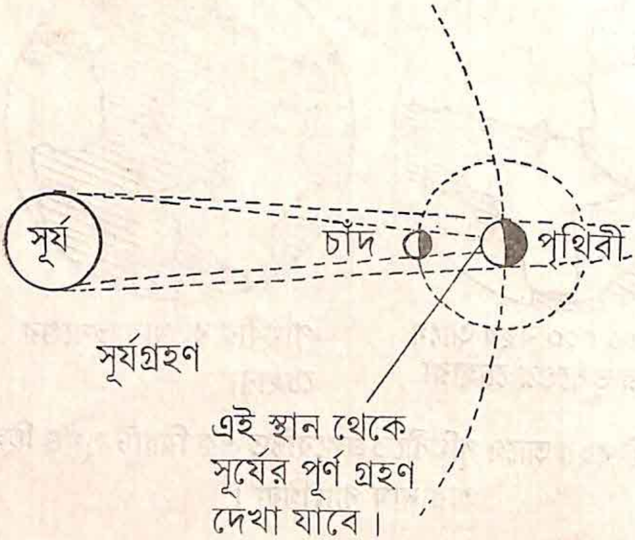


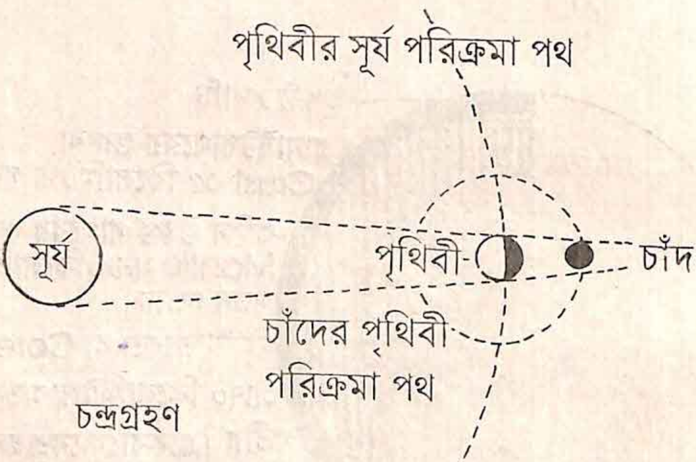
পৃথিবীর বর্তমান ভূখণ্ডের
চেহারা

বিশকোটি বছর আগে পৃথিবীতে জলবেষ্টিত এক বিরাট ভূখণ্ড ছিল। তার নাম প্যাংগিয়া।

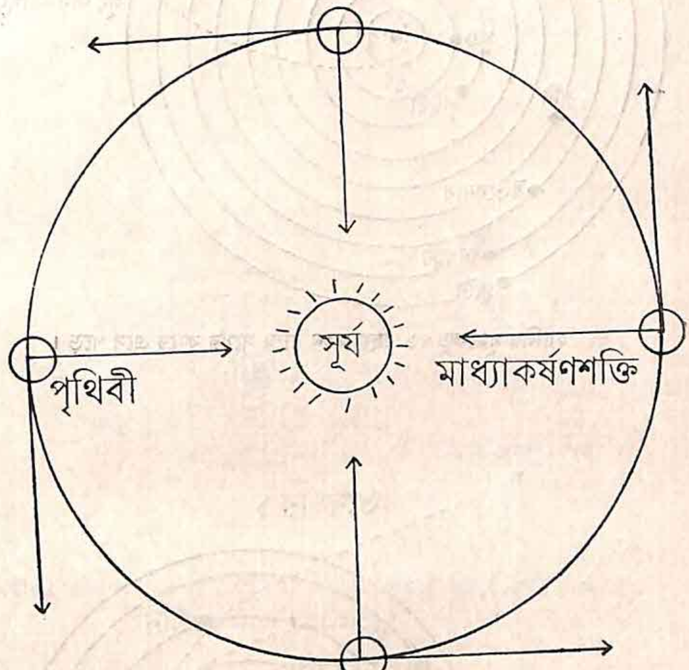


পৃথিবী

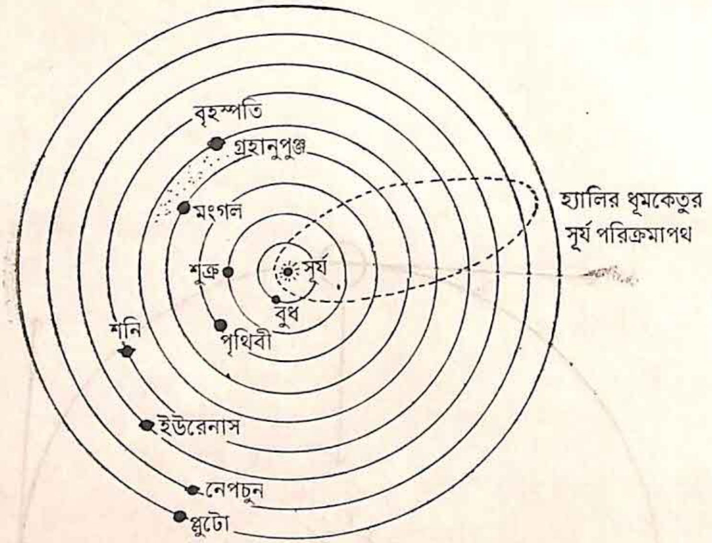




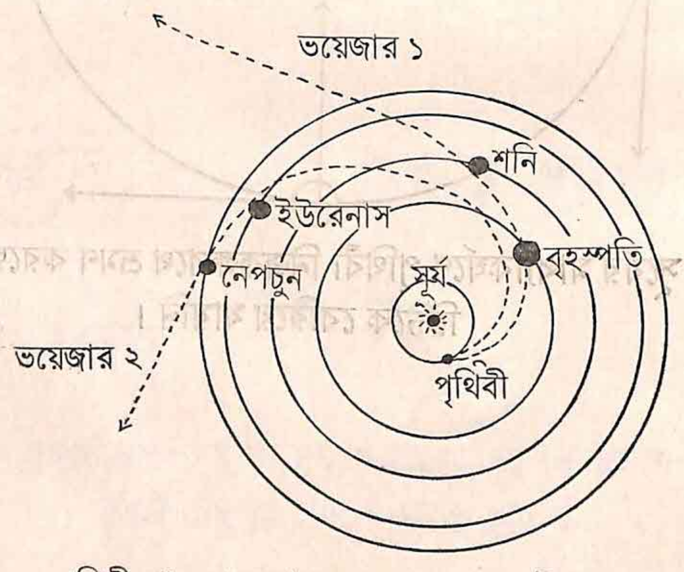
সূর্য গ্রহণে চাঁদের ছায়া সূর্যকে ঢেকে দেয় চন্দ্র গ্রহণে পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে ঢেকে দেয় ।



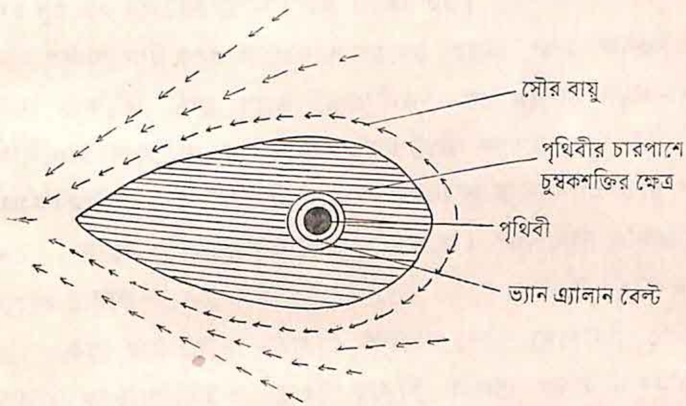
সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবী নিজকক্ষপথে ভ্রমণ করছে, ছিটকে বেরিয়ে যায়নি।



হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছর মতন বাদে সূর্যের কাছে এসে পড়ে।



পৃথিবী থেকে ভয়েজার এক ও ভয়েজার দুইএর যাত্রাপথ



পৃথিবীর চার পাশে চুম্বকশক্তির ক্ষেত্র সৌরবায়ুর অপকারী বিদ্যুৎ কণার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করছে।

॥ ১ ॥ সৌরজগতের কথা

বিকেলের খেলাধুলা সেরে যখন বাড়ির পথ ধরো, সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে, তখন আকাশের ঝিকমিক করা তারাদের দিকে তোমাদের চোখ পড়ে কি? রাতে ছাদে শুয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো ভাবো কি মহাকাশে পাড়ি দিলে কেমন হয়! রকেটে চড়ে দূর দূর গ্রহ নক্ষত্রের দেশে গেলে কেমন হয়!

পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এ ধরনের কল্পনা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হতো। কিন্তু হালে বৈজ্ঞানিকরা যে ধরনের নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যে রকমের রকেট তৈরী করেছেন, তাতে এ কল্পনা অনেকখানিই বাস্তব রূপ নিয়েছে। মহাকাশ যাত্রা আজ আর অসম্ভব নয়! মানুষ ইতিমধ্যেই চাঁদে ঘুরে এসেছে। মনে মনে ভাবছে এবারে কোথায় যাই।

একটা কথা হয়তো তোমরা কখনো ভেবে দেখোনা, যে রকেট চড়ার দরকার নেই। রকেট ছাড়াই আমরা বছরে একবার করে মহাকাশ ভ্রমণ করে আসছি।

আমাদের পৃথিবীটাই যেন একটা চলমান রকেট একটা মহাকাশ যান। পৃথিবী শুধু যে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের চারদিকেই ঘুরে আসছে তা নয়, প্রায় ৩৬৫ দিনে সূর্যের চারদিকেও একবার ঘুরে আসছে। সেই সাথে আমরাও ঘুরে আসছি। একা নয় সব্বাইকে নিয়ে। পিসিমা, দিদিমা, মামা কাকা এমন কি পাশের বাড়ির পোষা বেড়ালটাকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে। তোমরা বলবে বাঃ, এ আবার মহাকাশে বেড়ানো হলো নাকি। কিছুই তো দেখতে পেলুম না।

একথা কিন্তু সত্যি নয়। এই একবছরে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই। গ্রীষ্মের কড়া রোদ থেকে শ্রাবণের অঝোর ধারায় বৃষ্টি,

হেমন্তের হলদে পাতা ঝরা থেকে শীতের ঝিলমিলে রোদ। লাভও হয় অনেক। গরমের দিনে খেতে পাই আম কাঁঠাল আর শীতের দিনে কমলালেবু। পৃথিবীর পিঠে চেপে সূর্যের চারদিকে বছরে একবার ঘুরে না এলে এসব কিছুই আমরা উপভোগ করতে পারতুম না। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্যই আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন ঘটে। তেমনি সূর্যকে কেন্দ্র করে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের চারদিকে একবার ঘুরপাক খাবার জন্য পৃথিবীর দিন আর রাত্রি হয়। তবে শুধু ঋতু পরিবর্তনই নয়, এই একবছরে আকাশের দিকে তাকিয়ে নতুন নতুন তারাও দেখতে পাই। যে তারা গ্রীষ্মকালের আকাশে দেখতে পাবে, শীতকালে দেখবে তারা দূরে সরে গেছে। অন্য নক্ষত্রমণ্ডলী সে জায়গায় দৃষ্টিপথে চলে এসেছে।

আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন ইস্কুলের ভূগোলের বইতে পড়তুম পৃথিবীর চেহারা একটা কমলালেবুর মতো—উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। পৃথিবীটা যেন একটা মস্তবড় ফুটবল, একেবারে গোল। চাঁদে যাবার পথে মানুষ ভালো করে দেখে নিয়েছে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণে চাপা নয়, কোথাও কোনো টোলটক্কর নেই, একেবারে নিটোল সগোল পৃথিবী। দূর থেকে দেখায় যেন একটা মরকত মণি—সবুজ সাদা নীল। পৃথিবী আসলে একটি গ্রহ। সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আকাশের অসংখ্য তারার মত আমাদের সূর্যও একটি তারা। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে, অন্য কোনো গ্রহ থেকে যদি কেউ চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখে, দেখবে অন্য তারাদের মতো আমাদের সূর্যও ঝিকমিক করছে। খালি চোখে অবশ্য গ্রহ আর তারাদের আলাদা করার এটাই একমাত্র উপায়। তারারা ঝিকমিক করে, অর্থাৎ তাদের আলো যেন কাঁপছে বলে মনে হয়। সেখানে গ্রহদের আলো স্থির। দূর থেকে যদি পৃথিবীকে দেখি, দেখবো তার আলোও স্থির।

সূর্যের চারদিকে, শুধু পৃথিবী নয়, আরো বেশকিছু গ্রহ ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যের সব মিলিয়ে নয়টি গ্রহ আছে। একেবারে

কাছের গ্রহটি হচ্ছে বুধ (Mercury)। আর সব চাইতে দূরের গ্রহটি হচ্ছে প্লুটো (Pluto)। এই দুই এর মাঝে আছে শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn) ইউরেনাস (Uranus) আর নেপচুন (Neptune)। সূর্যের কতোটা কাছে এই হিসেব ধরলে আমাদের পৃথিবীর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। এই নয়টি গ্রহ আর সূর্যকে নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ (Solar System)। তবে গ্রহ ছাড়াও আমাদের সৌরজগতে আরো অনেক কিছু আছে। প্রথমত বুধ আর শুক্র ছাড়া সব গ্রহগুলিরই চাঁদ বা উপগ্রহ রয়েছে। কিছু গ্রহের আবার বলয় (Ring) আছে। এছাড়া ভ্রাম্যমান বেশ কিছু ধূমকেতু (Comet) আছে। এই তো কিছুদিন আগে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের সৌরজগতের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। প্রায় ৭৫-৭৬ বছর বাদে বাদে এই ধূমকেতুটি একবার করে কাছে চলে আসে।

এদিকে বৃহস্পতি আর মঙ্গল গ্রহের মাঝামাঝি আছে গ্রহাণুপুঞ্জ বা Asteroids। এগুলি হচ্ছে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের পাথর আর খনিজ পদার্থের চাঁই। অনেকদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিদরা গ্রহাণুপুঞ্জের কথা জানতেন না। শ'তিনেক বছর আগে তাঁরা অনুমান করেন যে গ্রহগুলি সূর্যকে যে নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রদক্ষিণ করছে তার হিসেব অনুযায়ী মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে আরো একটি গ্রহ থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু চোখে দূরবীণ লাগিয়ে, অনেক অঙ্ক কষেও তাঁরা আরেকটি গ্রহ খুঁজে পেলেন না। ইতিমধ্যে ১৮০১ সালে ইটালীর এক জ্যোতির্বিদ জুসেপ্পে পিয়াৎসি মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে এক মস্তবড় পাথরের চাঁই আবিষ্কার করলেন। এটিও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এটির নাম দেওয়া হলো সেরাস (Ceres)। বিস্তারে এটি প্রায় চারশো কিলোমিটার। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে জ্যোতির্বিদরা প্রায় তিন হাজার পাথরের টুকরো আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে সেরাস্‌ই আয়তনে সব চাইতে বড়। ছোট ছোট টুকরোগুলোর কোনটা আবার মাত্র দুই কিলোমিটার লম্বা।

পণ্ডিতদের ধারণা মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে এরকম প্রায় লাখখানেক পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। অন্য গ্রহদের মত এই ভাঙা এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরোগুলোও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এরাই হচ্ছে গ্রহাণুপুঞ্জ বা Asteroids। অনেকে আগে মনে করতেন গ্রহাণুপুঞ্জ হচ্ছে একটি বড় গ্রহের ভাঙা অংশ। ঘুরতে ঘুরতে গ্রহটি বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ টানের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, তার জন্যই তার এই দুরবস্থা—একেবারে ভেঙে চৌচির। আজকাল অবশ্য পণ্ডিতরা একথা বিশ্বাস করেন না। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে যে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে পণ্ডিতরা তাদের সংখ্যা কত হতে পারে, তাদের আয়তন আর বস্তুর ঘনত্বই বা কি এই সব হিসেব কোরে দেখেছেন যে এর থেকে পুরো একটি গ্রহ হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাহলে এই ভাঙাচোরা টুকরোগুলো এলো কোথা থেকে? জ্যোতির্বিদরা মনে করেন যে জ্বলন্ত গ্যাস্ থেকে গ্রহগুলি তৈরী হয়েছে। এই গ্রহাণুপুঞ্জ সেই গ্যাসের অবশিষ্ট অংশ দিয়েই তৈরী। ছিঁটে ফোঁটা যা বাকি পড়ে ছিল তাই পরে ঠাণ্ডা হয়ে পাথর আর খনিজ পদার্থের টুকরোতে পরিণত হয়েছে।

গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়াও সৌরজগতে আছে আরো অনেক ধুলোবালি পাথরের টুকরো। প্রায় প্রতিদিনই তাদের বেশকিছু পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। তোমরা ভাবছো, কই টের পাচ্ছি না তো। টের না পাবার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর চারধারে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার সাথে সংঘর্ষে এই বস্তুগুলি মাটিতে না পড়ার আগেই জ্বলে যায়। অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে যদি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকো তাহলে দেখবে হঠাৎ হঠাৎ যেন তারা খসে পড়ছে। এগুলিই হচ্ছে উল্কা (Meteors)। তবে পৃথিবীর বুকে দুমদাম করে এসে পড়ে এমন বস্তু আছে। একে আমরা বলি উল্কাপাত বা Meteorite। এগুলি ছোট বড় লোহার বা পাথরের টুকরো। ত্রিশ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনার মরুভূমিতে এক বিষম উল্কাপাত হয়েছিল। এক লোহার চাঁই এমন ধপ করে এসে মাটিতে পড়েছিল যে তাতে আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মত এক বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এই

গর্ত প্রায় ৬০০ ফুট গভীর আর খুব লম্বা। এতেই বোঝ কি জোর ধাক্কা লেগেছিল। আজ তারই কাছে উইনস্লো শহর। সেখানে গেলে আজও সে গর্ত দেখতে পাবে।

গ্রহাণুপুঞ্জের মত উল্কারা ছোট ছোট পাথরের টুকরো। অনেক সময় ধূমকেতু এসে ঘুরে চলে যাবার পর পেছনে অনেক ধূলোবালি ফেলে রেখে যায়। তা দিয়েও অনেক সময় উল্কা তৈরী হয়। ছোট ছোট ধূলোর কণিকা বিষম বেগে ঘুরছে,—সেকেণ্ডে প্রায় ৪৫ মাইল। পৃথিবীর আবহাওয়ার সাথে ধাক্কা খেলে সেগুলোর জ্বলে যাবারই কথা।

নীল আকাশের দিকে অথবা রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যতই ভাবো না কেন, আহা কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে আকাশ, মহাকাশ আসলে কিন্তু বড্ড নোংরা। সূর্য আর গ্রহগুলির মাঝে রয়েছে অজস্র ধূলো। এত রাশি রাশি পাথরের চাঁই ঘুরে বেড়ালে, ধাক্কা লাগলে ধূলো হবে না? আর সে ধূলো ঝাঁট দেবারও কেউ নেই। এর মাঝে আমরা মানুষেরা মহাকাশ আরো নোংরা করতে শুরু করেছি। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে যত রকেট, স্যাটিলাইট—কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছেন তাতে ওখানে জঞ্জাল বেশ বেড়ে গেছে।

কিছু রকেট স্যাটিলাইট অকেজো হয়ে যাওয়াতে ওখানেই ফেলে আসতে হয়েছে। কোন কিছুর সাথে ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত সেগুলোর আর ক্ষয়ক্ষতি নেই। পৃথিবীর চারদিকে, সেই সাথে সূর্যের চারদিকে তারাও ঘুরপাক খাচ্ছে। ধাক্কা লেগে ভেঙে গেলেও ভাঙা টুকরোগুলো ঘুরপাক খাবে। তোমাদের মনে আছে আমেরিকার পাঠানো মহাকাশ কেন্দ্র Skylab-এর কথা? আকাশে অকেজো Skylab-এর ভাঙাটুকরো গুলো একদিন ধুপধাপ করে পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়েছিল। তারজন্য কতলোকের কত ভয়, না জানি ঘাড়েই এসে পড়ে!

তাহলে ছাখো এই হচ্ছে আমাদের সৌরজগৎ। মাঝখানে সূর্য, তার চারপাশে নয়টি গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অজস্র চাঁদ, ধূমকেতু, উল্কা, ধূলো-

বালি সব ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যই হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র বা মধ্যমণি। তোমরা জানো বোধ হয়, অনেক বছর আগে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল পৃথিবীই হচ্ছে সব কিছুর কেন্দ্র। তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য, তারা প্রদক্ষিণ করছে। তারপর একদিন জ্যোতির্বিদরা গবেষণা করে স্থির করলেন একথা সত্যি নয়। পৃথিবী নয়, সূর্যই আমাদের কেন্দ্র। গ্রহ নক্ষত্র এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত তাকে প্রদক্ষিণ করছে।

আজ বৈজ্ঞানিকরা জোরালো টেলিস্কোপ ব্যবহার করে রকেট পাঠিয়ে, অনেক অঙ্ক কষে বুঝতে পেরেছেন এই বিরাট মহাকাশে আমাদের তারা-সূর্যের স্থান অতি নগণ্য। এমন আরো কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ তারা আছে আকাশে। তারা সবাই এক একটি সূর্য তাদের কেন্দ্র করেও গ্রহ উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীতো নয়ই, এমন কি সূর্যও এই মহাকাশের কেন্দ্র নয়। আমরা এর অতিসামান্য এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

॥ ২ ॥ তারার নাম সূর্য

শীতের ভোরে ঘুম ভেঙে কাঁথামুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসেছো কখনো? প্রথম সূর্যের নরম আলো যখন গায়ে এসে পড়ে, তখন কি ভালোই না লাগে। এই সূর্যই যখন গ্রীষ্মকালের ভরদুপুরে মাথার ওপর অগ্নিবৃষ্টি করে, তখন ভাবি কোথায় পালাই, কোন ঠাণ্ডা শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিই। সূর্যের তেজ আর উত্তাপ না পেলে একদিকে যেমন গাছপালা পশুপাখি ও মানুষের জীবনধারন অসম্ভব হতো। অন্যদিকে তেমনি সূর্যের তাপে সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এই কারণেই সভ্যতার গোড়ার দিক থেকেই মানুষ সূর্যকে সমীহ করে এসেছে। দেবতা বলে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছে।—

তবে একটা কথা বলে রাখি, সূর্য দেবতাও নয়, মানুষও নয়, সূর্য একটি তারা মাত্র। আকাশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারার মাঝে সূর্য একটি অতি সাধারণ তারা। খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। খুব উজ্জ্বলও নয়, খুব গরমও নয়। মহাকাশে এর থেকে অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল, অনেক অসাধারণ তারা আছে। তবে আমাদের কাছে সূর্য অসাধারণ। সূর্য আমাদের তারা—আমাদের একান্ত আপন তারা, সব চাইতে কাছের তারা। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে ১৫০ ০০০ ০০০ কিলোমিটার বা ৯৩ ০০০ ০০০ মাইল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে মাত্র ৮½ মিনিট সময় লাগে। সূর্যের পর অন্য যে তারাটি পৃথিবীর কাছাকাছি তার নাম হচ্ছে প্রক্সিমা সেনটরি Proxima Centauri। পৃথিবী থেকে এই তারাটির দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের তিন লক্ষ গুণ বেশী। এই দূরত্ব জ্যোতির্বিদরা আর কিলোমিটার বা মাইল দিয়ে হিসাব করেন না। এদের দূরত্ব আলোকবর্ষ বা Light year দিয়ে মাপা হয়। অর্থাৎ এক বছরে আলো যতটা দূর যায় সেই দূরত্ব দিয়ে। এই হিসেবে Proxima Centauri থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে ৪½ বছর। ভেবে দেখো তারাটি কতদূর।

দূরের তারার কথা ছেড়ে কাছের তারা সূর্যের কথা বলি এবারে। সূর্য হচ্ছে একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। সব সময় ওখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য প্রায় দশলক্ষ গুণ বড় আর ওজনে তিনলক্ষ গুণ বেশী ভারী। গ্রহদের মধ্যে আয়তনে একমাত্র বৃহস্পতিই সূর্যের সঙ্গে কিছুটা পাল্লা দিতে পারে। সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৩৯২০০০ কিলোমিটার বা ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবীর মত সূর্যও নিজের অক্ষরেখার চারপাশে ঘুরছে। তবে সূর্য পৃথিবীর মত নীরেট নয়, গ্যাস অবস্থায় আছে বলে সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চল অর্থাৎ মাঝখানের অংশটা বাইরের অংশ বা মেরু অঞ্চলের তুলনায় দ্রুত ঘোরে। মাঝের অংশটা ঘুরতে নেয় পৃথিবীর হিসেবে ২৫ দিন, আর বাইরের অংশটা ৩৫ দিন। অন্যান্য গ্রহ যেমন সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, সূর্য একটি তারা বলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। সূর্য কারুকে প্রদক্ষিণ করে না। কিন্তু—

সূর্য তার পরিবারের সবাই—অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, (এদের মধ্যে আমরাও আছি)—নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণ করছে। তোমরা বলবে কই টের পাচ্ছি না তো। মহাকাশের এমনিই মজা। সূর্য আমাদের সবাইকে নিয়ে ক্রমশ স্থান পরিবর্তন করছে—সেই সাথে আমরাও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছি—আমাদের ছায়াপথের লক্ষ লক্ষ তারার মধ্যে আমরা সূর্যের সাথে ঘণ্টায় ৪৩০০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করছি।

ছোটবেলায় দেখেছি আমার বৃদ্ধ পিসেমশাই হুঁকোর কলকের টিকে ধরাবার জন্যে একটা পুরু কাঁচের পরকলা বারান্দায় সূর্যের আলোয় এমনভাবে রাখতেন যাতে আলো একটি রেখায় এসে টিকের গায়ে লাগে। খানিকবাদে কালো টিকে ধপ্ করে জ্বলে উঠতো। আমাদের কাছে এ ছিল এক পরম বিস্ময়। ভেবে দেখো সূর্যরশ্মি কি শক্তিশালী, যার জন্যে এটা সম্ভব হয়।

এরজন্যে একটা কথা অবশ্যই মনে রেখো। **খালিচোখে সূর্যের দিকে কখনো তাকিয়ে থেকো না। দূরবীন বা পরকলা দিয়েও নয়।** সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমাদের চোখের ক্ষতি হবার—এমন কি অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বৈজ্ঞানিকরা এই কারণে বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ বা দূরবীন ব্যবহার করেন। এতে সূর্যের দিকে তাঁদের সরাসরি তাকাতে হয় না। তাঁদের চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও থাকে না। **এই কথাটা আশা করি মনে রাখবে।**

অনেক সময় আমরা খালি গায়ে সূর্যের আলোতে অর্থাৎ রোদে বসে থাকি। বিশেষ করে শীতের দেশের লোকেরা গায়ে রোদ লাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে **গায়ে অত্যধিক সূর্যরশ্মি লাগলেও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।** সূর্যের যেসব তেজস্ক্রিয় রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তার মধ্যে অনেক-গুলিই চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর।

এতদূরে থেকেও আমরা সূর্যের উত্তাপ টের পাই। কাজেই কল্পনা করে দেখো সূর্যের কেন্দ্রস্থলের অথবা পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ কি সাংঘাতিক

হবে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উত্তাপ সম্ভবত ১৫০০০ ০০০° সেন্টিগ্রেড বা ২৫০০০ ০০০° ফারেনহাইট আর বাইরে পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ ৫৫৩০° সেন্টিগ্রেড বা ১০ ০০০° ফারেনহাইট। এই প্রচণ্ড তাপে কোন ধাতু, পাথর বা অন্য বস্তু কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। সবকিছুই জ্বলন্ত গ্যাসে পরিণত হয়।

পণ্ডিতরা নানা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে সূর্য প্রধানত জ্বলন্ত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্তে প্রায় ৬৫০ ০০০০০০ টন হাইড্রোজেন গ্যাস পারমাণবিক প্রক্রিয়ার (Nuclear Fusion) হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে বিরাট উত্তাপ আর তেজশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এই তেজশক্তি সূর্যের অভ্যন্তর থেকে বাইরে বার হয়ে আসতে কয়েক লক্ষ বছর সময় নেয়। যখন বেড়িয়ে আসে তখন তা বাইরে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেজশক্তির অতি সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। এর মধ্যে যে শুধু উত্তাপ আর আলোই আছে তা নয়, এর ভেতর তেজস্ক্রিয় রশ্মিও থাকে। এর ভেতর গামা, আলট্রাভায়োলেট আর একস্‌রে (X-Ray) রশ্মিও আছে। এগুলি যদি পুরোপুরি পৃথিবীতে এসে পৌঁছতো, তাহলে পৃথিবীও এতদিনে বুধ ও শুক্রগ্রহের মত পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। সৌভাগ্যের কথা যে পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল আর চুম্বকশক্তির আচ্ছাদন রয়েছে তার দরুণ এটা ঘটতে পারে না। জীবন-ধারণের পক্ষে অপকারী তেজস্ক্রিয় রশ্মির খুব সামান্যই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

দূর থেকে সূর্যকে একটা হলদে রং-এর চাকৃতির মত দেখায়। বৈজ্ঞানিকরা নানা যন্ত্রের সাহায্যে নানা ছবি তুলে সূর্যের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। একেবারে কেন্দ্রস্থলটির নাম হচ্ছে Core। এখানে পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে আর প্রচণ্ড তেজশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এই তেজশক্তি দুটি স্তরের ভেতর দিয়ে সূত্রের বাইরের অংশ বা Photosphere-এ পৌঁছায়। এই স্তর দুটির নাম হচ্ছে Radiative Zone আর Convective Zone। পৃথিবী

থেকে আমরা সূর্যের যে আলোকময় অংশটা দেখতে পাই তারই নাম Photosphere। এটি হাল্কা জ্বলন্ত গ্যাসের একটি স্তর। সূর্যের আলো এখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়। Photosphere-এর বাইরে হচ্ছে Chromosphere। এই স্তরটি প্রায় কয়েকহাজার কিলোমিটার বিস্তৃত। এরপর রয়েছে Corona বা সূর্যের জ্যোর্তিমণ্ডল। Corona উত্তপ্ত হাল্কা গ্যাসে তৈরী। মহাকাশে এই গ্যাস লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে সূর্যের যেসব ছবি তুলেছেন—তাতে দেখা গেছে সূর্যের ওপরের স্তরের জ্বলন্ত গ্যাস যেন টগবগ করে ফুটছে। এই স্তরটি বুদ্‌বুদে ভর্তি। জ্বলন্ত বুদবুদের মাঝে কালো কালো দাগ। সর্বক্ষণ নতুন নতুন বুদবুদ তৈরী হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে এই বুদবুদগুলি ছোট মনে হলেও আয়তনে এরা বিশাল। এক একটি আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের সমান।

বুদবুদের মাঝে যে কালো দাগ—তার নাম দেওয়া হচ্ছে সূর্য কলঙ্ক (Sunspot)। সূর্যের গায়ে এক এক অংশে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার জুড়ে এই দাগ রয়েছে। তোমরা বলবে এই দাগ কিসের? এই দাগগুলি হচ্ছে কম গরম গ্যাসের। যেখানে সূর্যকলঙ্ক রয়েছে, তার চারপাশের গ্যাসের উত্তাপের থেকে—সেই অংশের উত্তাপ প্রায় ২০০০° সেন্টিগ্রেড কম। এর জন্য আশেপাশের জ্বলন্ত গ্যাসের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় এই অংশের ঔজ্জ্বল্য অনেক কম। দূর থেকে এই অংশটাকে তাই কালো কালো দেখায়। তবে সূর্যকলঙ্ককে যদি সূর্যের থেকে আলাদা করে দেখা যেত তাহলে দেখতে পেতে সূর্যকলঙ্ক আমাদের পূর্ণিমার চাঁদের থেকে শতভাগ বেশী উজ্জ্বল।

সূর্যকলঙ্কের জন্যে দায়ী হচ্ছে সূর্যের ভেতরের প্রচণ্ড চুম্বকশক্তি (Magnetic force)। সূর্যের কেন্দ্রস্থল থেকে এই শক্তি প্রচণ্ডবেগে বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার ঢুকে যায়। সূর্যের পৃষ্ঠদেশে যে স্থানে এটা ঘটে সেখানেই এই কালো কালো দাগগুলি দেখা যায়। কতগুলি দাগ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মিলিয়ে যায়। কতগুলি আবার

কয়েকসপ্তাহ স্থায়ী হয়। এক একটি দাগের বিস্তার প্রায় ৩০ ০০০ কিলোমিটার। কয়েকটি আয়তনে আমাদের পৃথিবীর সমান।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সূর্যকলঙ্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। গত তিনশো বছর ধরে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা গেছে দশ এগারো বছর বাদে বাদে সূর্যকলঙ্কের সংখ্যা চক্ররেখায় বাড়ে কমে। এক এক সময় সূর্যে কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখা যায় না। আবার কিছুদিন বাদে কলঙ্ক দেখা যেতে থাকে। ৫-৬ বছর ধরে এই কলঙ্ক বাড়তে থাকে। তারপর আবার ৫-৬ বছর ধরে কমতে থাকে।

১৯৮১ সালে বিরাট আয়তনের সূর্যকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। জোতির্বিদরা অনুমান করেন ১১ বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৯২-৯৩ সালে আবার বিরাট আয়তনের সূর্যকলঙ্ক দেখা যাবে। সূর্যকলঙ্কের প্রভাবে অনেক সময় পৃথিবীতে বেতার সংযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। অর্থাৎ তখন ঘরে বসে ভালো করে রেডিও শুনতে পাওনা।

সূর্যকলঙ্ক ছাড়াও সূর্যে নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটে। মাঝে মাঝে সেখানে জ্বলন্ত গ্যাসের বিপুল ঝড় বয়ে যায় (Solar Storm)। এই ঝড়ে যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ে।

সূর্যের বাইরের দিকে যে Corona বা জ্যোতির্মণ্ডল রয়েছে, সেখান থেকে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত গ্যাস প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে সৌরবায়ু (Solar wind)।

আমাদের পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডল আর চুম্বকশক্তির আচ্ছাদন ভেদ করে এই সৌরবায়ু পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না। যদি পৌঁছতো তাহলে আমাদের ক্ষতিই হতো।

সূর্যের পিঠে যেখানে সূর্যকলঙ্ক রয়েছে মাঝে মাঝে সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে আর বিদ্যুৎপাতের মত জ্বলন্ত গ্যাসের শিখা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বৈদ্যুতিক অণু-পরমাণুর বিরাট ঝড় মহাকাশে ঘণ্টায় ৩০০০০০০ কিলোমিটার বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের

পৃথিবীতে পৌঁছতে এর দুদিন সময় লাগে। তোমাদের আগেই বলেছি —পৃথিবীর চারপাশে চুম্বক শক্তির আচ্ছাদন রয়েছে। এই শক্তির জোর আমাদের উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে সব চাইতে বেশী। সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত এই বিদ্যুৎ কণিকা উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়ে সেখানকার বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে। এর ফলে ওখানকার বায়ুমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আর অপূর্ব আলোর সৃষ্টি হয়। একেই আমরা বলি মেরুজ্যোতি বা অরোরা বোরিএলিস। উত্তর মেরুতেই বিশেষ করে রাত্রিবেলা এই অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। বহুলোক এই মেরুজ্যোতি দেখার জন্য সেখানে ছুটি কাটাতে যায়।

আমাদের সৌভাগ্য যে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক কণিকার অতি সামান্য পরিমাণই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। যদি বেশী করতো আমরা তাহলে এতদিনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতাম। সূর্যের তৃতীয় গ্রহ হিসেবে আমরা অত্যন্ত নিরাপদ দূরত্বে রয়েছি (১৫০ ০০০ ০০০ কিলোমিটার)। এই নিরাপদ ব্যবধানের জন্যই পৃথিবীতে গাছপালা জীব মানুষের বিবর্তন সম্ভব হয়েছে—নদীনালা সমুদ্র শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়নি। সূর্যের পরিবারে আর যে ৮টি গ্রহ রয়েছে—তাদের কোথাও প্রাণের বিবর্তন এখনো সম্ভব হয়নি। বুধ, শুক্র, আর মঙ্গল মরুভূমির মতন জলহীন—পাথর ধূলোতে ভর্তি। বাদবাকি গ্রহগুলি এখনো গ্যাস অবস্থায়—জমাট বাঁধেনি। কাজেই সৌরজগতে সূর্য যেমন আমাদের একান্ত আপন তারা—আমাদের সস্নেহ উত্তাপ জোগাচ্ছে— আমরাও তেমনি একটি অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছি।

॥ ৩ ॥ কাছের গ্রহ বুধ

বলো তো সূর্যের সব চাইতে কাছের গ্রহ কোনটি? তোমরা বলবে, হ্যাঁ, এ আর জানি না—বুধ গ্রহ। তা ঠিক। সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব হচ্ছে ৫৮ ০০০ ০০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩৬ ০০০ ০০০ মাইল। বুধের

ইংরেজি নাম হচ্ছে Mercury। এ নামটি এসেছে পুরাকালের রোমান দেবতা Mercury এর নামের থেকে। তাঁর কাজ ছিল সংবাদ বহন করা।

আমরা অবশ্য হালে বুধ সম্পর্কে অনেক খবরই জানতে পেরেছি। আমাদের জন্য বার্তাবহের কাজ করেছে আমেরিকার পাঠানো Mariner 10 নামে মহাকাশ অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্রটি (Space Probe)। ১৯৭৪ সালে এই রোবট যন্ত্রটি বুধ গ্রহের পাশ দিয়ে যায়। আর যাবার সময় বেশ কিছু ছবি ও তথ্য বেতার যোগে আমাদের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের পাঠিয়েছে। এই ছবি দেখে, বুধ গ্রহটি যে কেমন হবে সে সম্পর্কে আমাদের বেশ ভালো ধারণা জন্মেছে। আর মনে হয় না, বুধে কেউ ছুটি কাটাতে চাইবে।

বুধ সূর্যের খুব কাছে বলে ওখানে ভীষণ গরম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের আম কাঁঠাল পাকার গরমের থেকে অনেক বেশী গরম ওখানে। বুধ গ্রহের চারপাশে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল না থাকাতে সূর্যের আলো একেবারে সরাসরি এসে ওর গায়ে লাগে। সূর্য যখন মাথার ওপরে অর্থাৎ ভরদুপুর বেলা তখন বুধে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৪২৬° সেন্টিগ্রেড (৮০০° ফারেনহাইট)। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে গ্রীষ্মকালে যে তাপ তার থেকে সাতগুণ বেশী। আবার রাত্রিবেলা তাপমাত্রা তেমনি ধপ্ করে নেমে যায় শূন্য ডিগ্রীর বহু নীচে। তখন তাপমাত্রা হচ্ছে মাইনাস ১৮০° সেন্টিগ্রেড (−৩০০° ফারেনহাইট)। তাহলেই বোঝো কি ঠাণ্ডা।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বুধের সব কিছু জ্বলে পুড়ে গেছে। সেখানে জল গাছপালা প্রাণী কিছুই নেই চারদিকে খা খা করছে জ্বলন্ত মরু, ছাই মাটি পাথর আর লাভা। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির বিরাট গহ্বর আর পাহাড়।

আয়তনে বুধ বিশেষ বড় নয়। এর ব্যাস হচ্ছে মাত্র ৪৮৮০ কিলোমিটার (৩০৩০ মাইল)। আর পৃথিবীর তুলনায় বেশ খানিকটা ছোট। আমাদের চাঁদের থেকে সামান্য বড়। সৌরজগতে বুধই সব

চাইতে ছোট গ্রহ। তবে ছোট হলে কি হবে, চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বুধের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার। ফলে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে, পৃথিবীর হিসেবে বুধের মাত্র ৮৮ দিন লাগে। সেখানে আমাদের লাগে ৩৬৫ দিন। সূর্যকে দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করলে কি হবে—নিজের চারদিকে ঘুরতে বুধের আবার বেজায় সময় লাগে। সে বেলায় যত গড়িমসি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় নিজের চারদিকে এক পাক্ খেয়ে নেয়; কিন্তু বুধের নিজের চারদিকে পাক্ খেতে পৃথিবীর হিসেবে লাগে ৫৮ দিন অর্থাৎ প্রায় দুমাস মতন সময়। ভেবে দেখো কাণ্ডখানা। বুধের একটি দিন হচ্ছে আমাদের দুমাসের মতন লম্বা। ফলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে পৌঁছতেই বুধের বছরের এক তৃতীয়াংশ সময় কেটে যায়।

বুধ গ্রহ আমাদের পৃথিবী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। খালি চোখেই দেখা সম্ভব। কিন্তু গ্রহটিকে দেখার খানিকটা অসুবিধা আছে। এর প্রদক্ষিণের পথ সূর্যের খুব কাছে বলে আকাশে ২৬ ডিগ্রির ঊর্ধ্বে গ্রহটিকে কখনো দেখা যায় না। ফলে আকাশের পূবদিকে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে অথবা পশ্চিম দিকে সূর্যাস্তের ঠিক পরে একেবারে দিগন্ত ঘেঁষে এর দেখা মিলবে।

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পথে মাঝে মাঝে বুধ গ্রহ পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে এসে পড়ে। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে তখন এটিকে মনে হয় যেন সূর্যের উজ্জ্বল গায়ে একটি কালো আঁচিল।

তোমাদের আগেই বলেছি Mariner 10 বুধ সম্পর্কে বেশ কিছু খবর পাঠিয়ে ছিল। তাতে দেখা গেছে বুধকে ঘিরে হিলিয়াম গ্যাসের একটা খুব পাতলা আবরণ আছে। কিন্তু এটা এত পাতলা যে ঠিক পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতন একটা কঠিন আবরণের কাজ করে না। পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলের বেষ্টনী থাকাতে মহাকাশ থেকে যা কিছুই প্রবেশ করার চেষ্টা করে তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেজন্যই নভোচারীরা যখন পৃথিবীতে ফেরেন, তখন তাদের অত্যন্ত সাবধানে ফিরতে হয়, যাতে তাদের নভোযান পুড়ে না যায়।

বায়ুমণ্ডলের জন্যেই পৃথিবীতে বড় বড় উল্কাপাত খুব একটা ঘটে না। কিন্তু বুধ গ্রহে ঠিক তার উল্টো। ওখানে প্রায় সর্বক্ষণই ধপাধপ উল্কাপাত হচ্ছে। মানুষ যদি বুধে বেড়াতে যায়, তাহলে মাথা বাঁচানো এক সমস্যা হবে।

ক্রমাগত উল্কাপাতের ফলে বুধের চেহারাটা দাঁড়িয়েছে খানিকটা আমাদের চাঁদেরই মত। কালো কালো গর্তে ভরা। কোটি কোটি বছর আগে গ্রহগুলি যখন সৃষ্টি হয় সেই সময়ই বুধে সব চাইতে বেশী উল্কাপাত হয়েছিল। এক একটা উল্কা (Meteorite) এত জোরে এসে আঘাত করেছিল যে প্রায় কয়েকশো কিলোমিটার লম্বা গর্তের সৃষ্টি করেছিল। আর সেই সাথে শুরু হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। প্রচণ্ড বেগে গলিত লাভা আর গলানো পাথরের স্রোত সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবে আজ আর বুধ গ্রহে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন না। তাহলে বলো ছাই পাথর আর ধুলো ভরা গর্তওয়ালা এই গ্রহটিতে কার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হবে? তারপর আবার যা গরম আর যা বিষম ঠাণ্ডা!

॥ ৪ ॥ প্রতিবেশী শুক্রগ্রহ

ভোররাতে বাবা মা অথবা ঠাকুমা যখন পরীক্ষার পড়াশেখার জন্য ঘুম থেকে ঠেলে তুলে দেন, তখন আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে পূবদিগন্তে জ্বল জ্বল করছে একটি তারা। তারাটির নাম শুকতারা। আবার সন্ধ্যাবেলা, সূর্যাস্তের অল্প পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা মিলবে ঐ তারাটির। তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা। আসলে কিন্তু ওটি আদৌ তারা নয়। লক্ষ্য করলে দেখবে ওর আলো স্থির। ওটি হচ্ছে একটি গ্রহ। আমাদেরই নিকটতম প্রতিবেশী শুক্র গ্রহ। ইংরেজিতে শুক্র গ্রহের নাম হচ্ছে Venus। নামটি এসেছে প্রাচীনকালের রোমানদের সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী Venus-এর নাম থেকে। গ্রহটি এত উজ্জ্বল

এত সুন্দর যে প্রাচীনকালের মানুষ তাকে দেবীরূপে কল্পনা করেছে।

খালি চোখে টেলিস্কোপ ছাড়া যে গ্রহগুলি অনায়াসেই দেখা যায়, সেগুলি হচ্ছে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র আর বুধ। এদের মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল হচ্ছে বৃহস্পতি আর শুক্র। শুক্রগ্রহকে উজ্জ্বল দেখাবার একটা কারণ আছে। তোমরা জানো বোধহয় যে গ্রহগুলির নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো তাদের ওপর প্রতিফলিত হয় বলেই দূর থেকে তাদের উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবীতে সূর্যের যতটা আলো এসে পড়ে, তার আর্ধেকেরও কম ভাগ প্রতিফলিত হয়। সেখানে শুক্রগ্রহে সূর্যের আলোর চারভাগের প্রায় তিনভাগই প্রতিফলিত হয়, আর সেজন্যই দূর থেকে গ্রহটিকে এত উজ্জ্বল দেখায়।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ শুক্রগ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য যোগাড়ের চেষ্টা করেছে, নানা কল্পনা করেছে। অনেকদিন পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল শুক্রগ্রহে প্রাণী থাকা সম্ভব। দেখতে শুনতে গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর মতই। আয়তনে খানিকটা ছোট হলেও খুব ছোট নয়। পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের কাছে হলেও বুধের মতন অতটা কাছে নয়। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১০৮২০০০০০ কিলোমিটার। ৬৭০০০০০০ মাইল। আর সবচাইতে বড় কথা—শুক্রের আকাশে, পৃথিবীর মতই রয়েছে মেঘ। সত্যি কথা বলতে কি শুক্রের আকাশ মেঘের চাদরে ঢাকা। এ মেঘ প্রায় পনেরো মাইল গভীর। মেঘের এই দূর্গ ভেদ করে ভেতরে কি আছে জানা সহজে সম্ভব নয়। তাই অনেকেই মনে মনে ভেবেছেন মেঘ যখন আছে—তার মানে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। তাহলে হয়তো মানুষ না হলেও, শুক্রগ্রহে প্রাণী গাছপালা সমুদ্র, নদী এসব রয়েছে। 'জন্তু সত্যি আছে কি?' খবর জোগাড় করা যায় কি করে? প্রধান অসুবিধা হচ্ছে দূরত্ব। সৌরজগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে শুক্রগ্রহ পৃথিবীর সব চাইতে কাছে হলেও; পৃথিবীর থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ৪১৪০০০০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ২৬০০০০০০ মাইল। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ২৪০০০০ মাইল। পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে মানুষের লেগেছিল

তিনদিন সময়। সেখানে ভেবে দেখো পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে যেতে হলে মানুষের কত সময় লাগবে। হয়তো তিনমাসই লেগে যাবে। মহাকাশে এত দূর, এত দীর্ঘদিনের যাত্রার উপযুক্ত রকেট, সাজসরঞ্জাম মানুষ এখনো আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। এর ওপর আবার সঙ্গে নিতে হবে—খাবার, জল, ওষুধ। মহাকাশে তো আর বাজার বসে না, যে দুদণ্ড থেমে সওদা করে নেব। তাই বলে বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য হাল ছেড়ে দেন নি। তাঁরা রকেটের সাহায্যে মহাকাশের দূর দূরান্তরে তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্র বা Space Probe পাঠাতে শুরু করেছেন। ভাবখানা, আগে পাঁচু গিয়ে দেখে আসুক জায়গাটা কেমন। এ পর্যন্ত ২১টি তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্র শুক্র গ্রহে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে রুশ্‌রা পাঠিয়েছে ১৬টি আর মার্কিনীরা পাঠিয়াছে ৫টি। এই Space Probe বা রোবট যন্ত্রগুলির দৌলতে জ্যোতির্বিদ্‌রা এখন শুক্রগ্রহ সম্পর্কে বেশ খানিকটা তথ্য জোগাড় করতে পেরেছেন।

১৯৬৬ সালে রুশদের Venera ৩ নামে রোবটযন্ত্রটি শুক্রগ্রহে অবতরণ করে। কিন্তু ওখানকার বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড চাপে তখুনি অকেজো হয়ে যায়। এই Space Probe-টি পৃথিবীতে কোনো খবরই পাঠাতে পারে নি। ১৯৭৫ সালে রুশদের Venera ৭ আর Venera ১০ শুক্র গ্রহে অবতরণ করে। এবারে অকেজো হয়ে যাবার আগে যন্ত্রদুটি বেশ খানিকক্ষণ কাজ চালিয়ে যায়। এদের দৌলতে পৃথিবীতে শুক্রগ্রহের প্রথম ছবি এসে পৌঁছায়। ১৯৮২ সালে রুশরা পাঠায় Venera ১৪। এটিও শুক্রগ্রহের মাটিতে নেমে গ্রহটির ছবি আর মাটির নমুনার খবর পাঠায়। কিন্তু এদের মধ্যে কোন যন্ত্রটিই বেশিক্ষণ টিকে থাকে নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অকেজো হয়ে গেছে।

শুক্রগ্রহের খবর সংগ্রহে মার্কিনীরাও বসে থাকেনি। রুশদের মত তারাও Space Probe বা তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্র পাঠাতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালে তারা দুটি যন্ত্র পাঠায়। এদের একটি Pioneer Venus I শুক্রের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ছবি পাঠায়। অন্যটি বায়ু-

মণ্ডলে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানের খবর ও ছবি পাঠায় আর তারপর মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। এই সব ছবি ও তথ্য থেকে শুক্রগ্রহের চেহারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আজ আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে।

পৃথিবীর মত শুক্রও নিজের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু খুবই আস্তে আস্তে ধীরগতিতে ঘোরার ফলে শুক্রের একটি দিন, পৃথিবীর ১১৭ দিনের সমান—অর্থাৎ প্রায় চার মাসের মতন লম্বা। আরেকটা মজা হচ্ছে পৃথিবী নিজের চারদিকে পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে। শুক্র ঠিক তার উল্টো পূব থেকে পশ্চিমে ঘোরে বলে শুক্রের সূর্যোদয় হয় পশ্চিমে। আর অস্ত যায় পূবদিকে। পৃথিবীর মত শুক্রও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এতে পৃথিবীর দিনের হিসেবে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে শুক্রের লাগে ২২৫ দিনের মতন। কিন্তু শুক্রের দিনের হিসেবে মাত্র দুটি দিন। অর্থাৎ একটি শুক্র বছরে মাত্র দুটি শুক্র দিন। আর এ দুটি দিনই যদি শনি আর রবি হয় তাহলে কি মজা। সারা বছরই ছুটি।

কিন্তু ছুটি কাটাবার মত গ্রহ শুক্র কি? গ্রহটি সূর্যের কাছে বলে এর তাপমাত্রা যে পৃথিবীর থেকে বেশি হবে এ নিয়ে কারোর মনেই কোন সন্দেহ ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন হয়তো ওখানে মরুভূমি, তাতে গরম হাওয়ার ঝড় বইছে। কিংবা গরমজলের সমুদ্র টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু এখন Space Probe বা রোবট যন্ত্রগুলির পাঠানো ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে শুক্র, বুধগ্রহ বা চাঁদের মতই ধূলো বালি, নিভন্ত আগ্নেয়গিরি, পাহাড়, পর্বত আর পাথরের চাঁই এ ভর্তি এক প্রাণহীন মৃতগ্রহ। গ্রহটি যে শুধু গরম তাই নয়, বিষম গরম, এর তাপমাত্রা ৪৭০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৯০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট। বুধগ্রহের থেকেও এর তাপমাত্রা বেশি। এত গরমে ওখানে কোনো জলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। থাকলে তখুনি তা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। শুধু যে জল তাই নয়, অত গরমে আমাদের পরিচিত কোনো গাছপালা বা প্রাণী থাকাও সম্ভব নয়।

শুক্রগ্রহের এতটা উত্তাপের একটা কারণ হচ্ছে ওর ঘন মেঘের

আবরণ। এর ফলে গ্রহটি একটি কাঁচ ঘরে পরিণত হয়েছে। বাইরে থেকে আলো ঢুকছে—উত্তাপ ঢুকছে। কিন্তু বেরোতে পারছে না। বাতাসও ঢুকতে পারছে না।

শুক্রের আকাশে ঘনমেঘের আবরণ আছে শুনে তোমরা যারা আষাঢ় মাসের সজল মেঘের কথা ভাবছিলে তারা এখুনি হতাশ হবে। শুক্রের আকাশ হালকা হলদে রং-এর মেঘে ঢাকা। এ মেঘ স্যালফিউরিক অ্যাসিডের মেঘ। যে অ্যাসিডে সবকিছু জ্বলে পুড়ে যায়। এরপর আবার শুক্রের বায়ুমণ্ডলের ৯৭ ভাগই কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস ভর্তি। আমাদের বায়ুমণ্ডলে আছে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন আর মাত্র শতকরা ·৩৩ ভাগ কার্বনডাইঅক্সাইড। কোনো জীবের পক্ষেই শুক্রের বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। শুক্রের বায়ুমণ্ডলের চাপও অত্যন্ত বেশি। আমাদের পৃথিবীর থেকে প্রায় নব্বুই গুণ বেশী। এক্ষেত্রে রোবট যন্ত্রগুলি যে অবতরণের অল্পপরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্যের কি।

চাঁদের মতই শুক্রগ্রহের কলা রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর থেকে যদি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখ, দেখবে চাঁদের মতই শুক্র আয়তনে বাড়ছে বা কমছে। এর কারণ হচ্ছে শুক্রের সূর্য পরিক্রমার পথ পৃথিবীর আর সূর্যের মাঝে। তার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থান থেকে আমরা গ্রহটিকে দেখতে পাই—কখনো এর কম অংশ কখনো বেশী। বুধগ্রহের মত শুক্রগ্রহও ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে এসে পড়ে। তখন তাকেও মনে হয় যেন সূর্যের গায়ে একটা কালো তিল। তবে বুধ যেমন মাঝে মধ্যেই পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে এসে পড়ছে শুক্রের ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। ১৮৮২ সালে শুক্র পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে এসেছিল। জ্যোতির্বিদ্‌রা অনুমান করেছেন ২০০৪ খৃষ্টাব্দে হয়তো আবার এ ধরনের ঘটনা ঘটবে।

মার্কিনীদের রোবট যন্ত্র Pioneer Venus I যে খবর পাঠিয়েছিল, তাতে শুক্রগ্রহের একটা মোটামুটি ম্যাপ ছকে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই ম্যাপে শুক্রের বিরাট পাহাড় পর্বত উপত্যকা মালভূমি, নিভে

যাওয়া আগ্নেয়গিরি সব দেখানো হয়েছে। শুক্রের বেশ অনেকখানি অংশই পৃথিবীর মত সমতল ভূমি। এক একটা জায়গায় চেহারা দেখে মনে হয়—হয়তো কোনোকালে সেখানে সমুদ্র ঘেরা মহাদেশ ছিল। শুক্রের সবচাইতে উঁচু পাহাড়ের নাম দেওয়া হয়েছে Maxwell Montes—এটি প্রায় ১১ কিলোমিটার বা ৭ মাইল উঁচু। আমাদের মাউন্ট এভারেস্ট থেকেও অনেক উঁচু।

এই নামকরণের প্রসঙ্গে একটা কথা বলি তোমাদের। পৃথিবীতে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আধিপত্যের জন্য অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও গ্রহতারকা সব কিছুরই প্রাচীন গ্রীক বা রোমান দেবদেবীর নামে নামকরণ হতো। ভারতীয় বা চীনারা এইসব গ্রহতারকা সম্পর্কে বহুকাল আগেই সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাদের দেওয়া নামগুলি ভারত বা চীনের বাইরে ছড়াতে পারেনি। কিন্তু এখন মহাকাশে নামকরণ সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে পৃথিবীর সব সভ্যতার পৌরাণিক কাহিনীর দেবীদের নামে শুক্রগ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। শুনে খুশি হবে এই গ্রহের উত্তর দিকে একটি অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে "লক্ষ্মী"। যদি কোনোদিন শুক্রগ্রহে যাও—লক্ষ্মীতে বেড়াতে যেতে ভুলো না।

॥ ৫ ॥ তিন নম্বরে আমরা থাকি

তোমাদের যদি বলি তিন নম্বরে আমরা থাকি, তাহলে বলবে রাস্তার নাম বলুন, ঠিক খুঁজে নেবো তিন নম্বরের বাড়িটা। না, এ নম্বর রাস্তার বা বাড়ির নম্বর নয়, এ হচ্ছে আমাদের গ্রহের নম্বর। সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে পৃথিবীর নম্বর হচ্ছে তিন। গোলগাল নীল সবুজ পৃথিবী সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ, আর সে গ্রহেই আমাদের সবার বাসা।

প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন পৃথিবীই হচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। তার চারপাশে সূর্যতারা ঘুরপাক খাচ্ছে। কোপার-

নিকাস সর্বপ্রথম এই ভুল ধারণা ভেঙে দেন। আজ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি পৃথিবীতো নয়ই সূর্যও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়। আমাদের সৌরজগতের মত মহাভাগে আরো অনেক জগৎ আছে। তাদের আবার নিজেদের সূর্য গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে। তবে আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য আর তাকে ঘিরে যে নয়টি গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে, পৃথিবী তাদের একটি।

আমাদের কাছে পৃথিবীর একটি বিশেষ কদর আছে। প্রথমত এখানে আমরা থাকি। দ্বিতীয়ত সৌরজগতে হয়তো একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা যেটুকু আবিষ্কার করেছেন, তাতে দেখতে পেয়েছেন সূর্যের কাছের গ্রহ, বুধ আর শুক্রে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। গ্রহ দুটি প্রচণ্ড গরম। মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের যেটুকু কল্পনা পণ্ডিতরা করেছিলেন, এখন রোবট যন্ত্রগুলির—দৌলতে দেখা গিয়েছে মঙ্গলও বুধ ও শুক্রের মত প্রাণহীন মরুভূমি। সেখানে অ্যামিবাজাতীয় অতিক্ষুদ্র প্রাণীরও বেঁচে থাকা কঠিন। দূরের অতিকায় গ্রহগুলি—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এখনো গ্যাসীয় অবস্থায়। সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর নবমগ্রহ প্লুটো সূর্য থেকে এত দূরে যে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সব কিছুই জমানো অবস্থায় রয়েছে। সেখানেও প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। বুঝতেই পারছো সৌর-জগতে আমাদের সুজলা সুফলা পৃথিবী তাই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

গ্রহ হিসেবে পৃথিবী সূর্যের ছোট গ্রহগুলির একটি। তবে পৃথিবী বুধ শুক্র আর মঙ্গলের থেকে আয়তনে বড়। পৃথিবীর ব্যাস ১২৭৫৬ কিলোমিটার বা ৭৯৩০ মাইল। পৃথিবী সূর্যের কাছে হলেও খুব একটা কাছে নয়। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৪৯৬০০ ০০০ কিলোমিটার বা ৯৩০০০০০০ মাইল। এই দূরত্ব একেবারে উপযুক্ত দূরত্ব। অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে যে পরিমাণ সূর্যালোকের দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ আলোই সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে। এর চাইতে বেশি উত্তাপ পেলে পৃথিবীতেও বুধ আর শুক্রের মত সব কিছু জ্বলে পুড়ে

ছাই হয়ে যেত। আর উত্তাপ কম হলে পৃথিবী মঙ্গলের মতন ঠাণ্ডা, জলহীন মরুভূমিতে পরিণত হতো। একথাটি যে কত খানি সত্য তা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। লিবিয়ার আল্ আজিজিয়া স্থানটিতে সূর্যের তাপ ৫৮° সেন্টিগ্রেড বা ১৩৬° ফারেনহাইটে ওঠে। সেখানে কিছু গজায় না—শুধু ধূ-ধূ করছে বালি—সাহারা মরুভূমি। অন্যদিকে দক্ষিণমেরুতে ভস্টক নামে জায়গাটিতে তাপমাত্রা মাইনাস—৮৮° সেন্টিগ্রেড বা মাইনাস—১২৬° ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেবে যায়। সেখানেও কিছু গজায় না। যে দিকে তাকাও শুধু বরফ।

অন্যগ্রহের মত পৃথিবীও সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর লাগে ৩৬৫ দিনের সামান্য বেশি। চারবছর অন্তর ঐ সামান্য বেশী সময়টুকু যোগ করে আমরা ফেব্রুয়ারী মাসের সাথে একটা বেশি দিন যোগ করে দিই। যে বছরটাকে বলি লিপ্ ইয়ার। তখন ফেব্রুয়ারী মাস হয় ২৯ দিনে। নিজের চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর ২৪ ঘন্টার সামান্য কম সময় লাগে। অঙ্ক কষে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড।

আজ থেকে প্রায় ৫০০০ ০০০ ০০০ বছর আগে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলির সাথে একই সময়ে পৃথিবীরও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের একটি পিণ্ড। বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটেছে। একসময় শুক্রগ্রহের মতন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও বিষাক্ত মিথেইন, অ্যামোনিয়া, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভর্তি ছিল। কবে কখন পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে বলা কঠিন ; তবে পণ্ডিতরা ফসিল থেকে অনুমান করেন প্রায় ৩০০০ ০০০ ০০০ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এগুলি ছিল এককোষী উদ্ভিদ বা অ্যামিবা জাতীয় প্রাণী।

পৃথিবীতে আমাদের বাস বলে গ্রহটি সম্পর্কে আমরা অনেক খবর রাখি। বুধ আর শুক্রের মত এই গ্রহটিও কঠিন পাথরে তৈরী। ভূপৃষ্ঠের নীচে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত কঠিন পাথরের নানা স্তর রয়েছে। একেবারে ওপরের দিকে মাটির ঠিক নীচে যে পাথরের স্তর

রয়েছে তা ৩৫ কিলোমিটার বা ২২ মাইল মতন পুরু। তবে স্থানে স্থানে এর চাইতেও কম। এই স্তরটি হালকা ধরনের গ্রানাইট আর ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরী। ইংরেজিতে এই স্তরটির নাম হচ্ছে Crust। পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসমুদ্র, পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি সবই এই স্তরে রয়েছে। এর নীচে আছে ২৮৮০ কিলোমিটার বা ১৮০০ মাইল গভীর পাথরের এক স্তর। একে বলে ম্যান্টেল (Mantel)। এই স্তরের পাথর উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। এই পাথর চাপ পড়লে বেঁকে যায়, জোরে ধাক্কা লাগলে ভেঙে যায়। এর নীচে আছে ৩৮৭০ কিলোমিটার বা ২১৭০ মাইল গভীর এক স্তর। পণ্ডিতরা অনুমান করেন এই স্তরটি লোহা আর নিকেলে তৈরী। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রস্থলটি ঘনীভূত অবস্থায় থাকলেও তার বাইরের অংশটি এখনও তরল অবস্থায় আছে। ইংরেজিতে এর নাম হচ্ছে Core। এখানকার তাপমাত্রা সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার সমান। অর্থাৎ প্রায় ৬১০০° সেন্টিগ্রেড বা ১১০০০° ফারেনহাইট।

বাইরে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে বার বার পা ঠুকে পৃথিবীকে যত নীরেট কঠিন আর স্থির বলেই মনে হোক না কেন, মাটির ভেতরে বিভিন্ন স্তরে এখনো পরিবর্তন ঘটছে। ভূপৃষ্ঠের ঠিক নীচে যে স্তর রয়েছে (Crust) তা যেন বড় বড় শিলাখণ্ড (Slab)। সেগুলি যেন নীচের স্তরের (Mantel) অপেক্ষাকৃত তরল উত্তপ্ত তরল পাথরের স্রোতে ক্রমাগত নড়ে চড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এর ফলে এক শিলাখণ্ডের সাথে আরেক শিলাখণ্ডের ধাক্কা লাগছে। এই ধাকার পেটে কখনো ভূমিকম্প, কখনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়ার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কথা তোমাদের মনে আছে। আমেরিকায় ক্যালি-ফোর্নিয়ায় বহুকাল ধরে মানুষ একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের অপেক্ষা করে আছে। ভূ পৃষ্ঠের নীচে গ্রানাইট আর ব্যাসাল্ট পাথরের স্তর ক্রমাগত নড়ে চড়ে বেড়ানোর ফলেই ভূ পৃষ্ঠে নানা ধরণের আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে। মজা হচ্ছে এই পাথরের স্তরের ওপরে যে মহাদেশ ও মহাসমুদ্রগুলি রয়েছে, সেগুলিও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। ইংরেজিতে একে

বলা হয় Continental drift। এই পরিবর্তন পৃথিবীর বয়সের হিসেবে ঘন ঘন হলেও মানুষের বয়সের হিসেবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি ধীরে ধীরে হচ্ছে। আমাদের ৭০।৮০ বছরের গড়পড়তা জীবনকালে এই পরিবর্তন চোখে দেখা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অ্যালফ্রেড ভেগনার নামে এক জার্মান ভূতত্ত্ববিদ্ সর্বপ্রথম এই পরির্তনের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কথা যে কত সত্যি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে।

প্রায় বিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর মানচিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় পৃথিবীর সমস্ত স্থল এলাকা একসাথে একটা বিরাট মহাদেশ হিসেবে ছিল। এই স্থল এলাকা ঘিরে ছিল জল। পণ্ডিতরা এই বিরাট মহাদেশের নাম দিয়েছেন প্যাঙ্গিয়া (Pangaea)। এর মানে হচ্ছে 'শুধু স্থল'। এরপর এই বিরাট মহাদেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বর্তমান মহাদেশগুলির রূপ নিয়েছে। আগে ভারতবর্ষ ছিল আফ্রিকার সাথে যুক্ত। আফ্রিকা ছিল দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত। যে বিরাট শিলাখণ্ডের ওপর আফ্রিকা মহাদেশ তা সড়তে সড়তে একদিন পূব দিকে চলে এসেছে আর দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা পশ্চিমে সড়ে গেছে। মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের। মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা কত সহজে আফ্রিকার সাথে জোড়া লেগে যায়। ভারতীয় ভূখণ্ডও তেমনি একদিন আফ্রিকার মাদাগাস্কারের কাছ থেকে সড়ে চীনের ভূখণ্ডের সাথে জোড়া লেগেছে। এসব ঘটেছিল বিশ কোটি বছর আগে। তবে এ ধরনের নড়াচড়া সড়ে যাওয়া এখনও ঘটছে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন আজ থেকে প্রায় কোটি কোটি বছর বাদে পৃথিবীর মানচিত্র পালটে যাবে। তখন হয়তো অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর আয়তনে আরো বড় হবে। ভূমধ্যসাগরের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও ইয়োরোপ মিশে যাবে।

মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির নড়েচড়ে বেড়ানোর কারণ হচ্ছে পৃথিবীর

মাঝের স্তরে যে উত্তপ্ত পাথর আছে তা ওপর দিকে চাপ দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। ওপরের স্তরের (Crust) ঠাণ্ডা পাথরে ধাক্কা লাগলে এই উত্তপ্ত পাথরের স্রোত দুটি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে আবার নীচের দিকে নেবে যায়। মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি যে বিরাট বিরাট শিলাখণ্ডের ওপর অবস্থিত সেই শিলাখণ্ডগুলি উত্তপ্ত পাথরের স্রোতে নড়েচড়ে সড়ে যায়। এই ধরণের শিলাখণ্ড (Continental Plate) যেখানে একটি শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হয়েছে—সেখানেই ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত হবার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয় এক এক সময় দুটি শিলাখণ্ডে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার ফলে একটি আরেকটির ওপরে উঠে যায়—তখন পৃথিবীর পিঠে নতুন পর্বতমালা, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। আমাদের হিমালয়, ইয়োরোপের আল্পস পর্বতমালা একদিন এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখনও যে আগুন জ্বলছে—নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটছে—এ দৃষ্টান্ত সৌরজগতে আর খুব একটা নেই। তোমরা জানো বোধহয় প্রশান্তমহাসাগর এলাকাতেই সবচাইতে বেশি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। হাওয়াই দ্বীপ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আলাস্কা থেকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমকূল পর্যন্ত এই আগ্নেয়গিরি ছড়ানো। অন্য আগ্নেয়গিরিগুলি ইটালী আর উত্তর আটল্যান্টিক মহাসাগরে আইসল্যাণ্ড এলাকায় দেখা যায়। এই আগ্নেয়গিরিগুলি দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল পাথরের স্রোত বা লাভা ভূ পৃষ্ঠে বার হয়ে আসে।

পৃথিবীর চেহারা ক্রমাগত বদলে যাবার আরেকটি কারণ হচ্ছে জল। অন্য কোনো গ্রহে মাটির ওপর জল আছে বলে প্রমাণ এখন পর্যন্ত মেলেনি। সেখানে পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই জল। সৃষ্টির গোড়ার দিকে অন্য গ্রহের মত পৃথিবীর পিঠের ওপরও দুমদাম করে প্রচণ্ড উল্কাপাত হয়েছিল। কিন্তু আজ জলের দরুণ সেসব উল্কাপাতের চিহ্ন দু একটি স্থানে ছাড়া খুঁজে পাওয়া কঠিন। জলে মাটি পাথর যে ক্ষয়ে যায় একথা বোধহয় জানো। নদী সমুদ্র হিমবাহ বন্যা, প্লাবন সব কিছুই পৃথিবীর পাথুরে চেহারাটা ক্রমশ পাল্টে দিয়ে সবুজ,

শ্যামল করে তুলেছে। কোথাও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিমবাহ পাহাড় পর্বতের মাথা ক্ষইয়ে টেবিলের মত চ্যাপ্টা করে দিয়েছে ; কোথাও বন্যা, প্লাবন মরুভূমির বালুর ওপর পলিমাটির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার অ্যারিজোনার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখতে অনেকেই যান। সেখানে মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কলোরাডো নদী এমন গভীর খাদ কেটেছে যে নদীর দু পাশের পাহাড়ের গায়ের বহু কালের প্রাচীন পাথরের স্তর বার হয়ে পড়েছে। ভ্রমণ-কারীরা দল বেঁধে এই পাথুরে খাদ দেখতে যায়।

এতো গেল পৃথিবীর ভেতরের কথা। পৃথিবীর বাইরের কথা বলি এবারে। পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। সৌরজগতে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে বায়ুমণ্ডলে প্রাণীর জীবনধারণের উপযুক্ত গ্যাস—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে। এই বায়ুমণ্ডল বা আব-হাওয়া না থাকলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হতো। পৃথিবীর আবহাওয়ায় আমরা যে ধরণের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে অভ্যস্ত তাতে মোটামুটিভাবে শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন আর ১ ভাগ কার্বনডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস রয়েছে। এধরণের বাতাস সমুদ্রকূলেই সব চাইতে বেশি।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাধ্যাকর্ষণ ব্যক্তির প্রচণ্ড টানে পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে—দূর শূন্যে ছিটকে বেড়িয়ে যেতে পারেনি যেমনটা—মঙ্গল আর বুধ গ্রহে হয়েছে।

পৃথিবীর ওপরে প্রায় কয়েকশো কিলোমিটার বা মাইল পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। তবে এটিকে নানা স্তরে ভাগ করা যায়। বায়ুমণ্ডলের একেবারে নীচের দিকে—পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি যে স্তরটি রয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে—Troposphere। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার বা ৭ মাইল পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। আকাশে যে মেঘ দেখতে পাই তা এই স্তরে থাকে। ঝড় বৃষ্টি এই স্তরেই ঘটে।

Troposphere-এর ওপর রয়েছে Stratosphere। এই স্তরটি ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বা ৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

জেট্ এরোপ্লেন প্রায়ই এই স্তর দিয়ে উড়ে যায়। খবরের কাগজে হয়তো দেখে থাকবে যে বায়ুমণ্ডলে Ozone স্তরে ফুটো হবার আশঙ্কায় বৈজ্ঞানিকরা হৈ চৈ শুরু করেছেন। কারণ এই ফুটো দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। Stratosphere বা Ozonosphere একই স্তর। এই স্তরের পর আছে। Mesosphere আর Ionosphere। Mesosphere ৫০ থেকে ৮০ কিলোমিটার উর্ধ্বে (৩০—৫০ মাইল) বিস্তৃত আর Ionosphere ৭০ কিলোমিটার উর্ধ্বে (৪০ মাইল) বিস্তৃত। তবে বাতাস এখানে এত ক্ষীণ এবং তার চাপ এত কম যে পৃথিবী থেকে ১২০ মাইল মতন উর্ধ্বেই বায়ুমণ্ডল শেষ হয়ে মহাকাশ শুরু হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। Ionosphere-এর স্তরে পৃথিবীর বেতার তরঙ্গ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ অত্যন্ত বেশি। সাধারণত আমাদের শরীরের ওপর দশ টন বাতাসের চাপের মধ্যে আমরা চলাফেরা করি। তবে ছোটবেলা থেকেই এই চাপের ভেতর থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই চাপ অনুভব করি না। সমুদ্রের কাছে এই চাপ সব চাইতে বেশি। যতই পাহাড়ের উচুঁতে ওপরের দিকে উঠবে ততই এই চাপ কমে আসবে। এরজন্য উচুঁতে উঠলে অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একদিকে যেমন সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে, অন্য দিকে সূর্যের উত্তাপ ধরে রেখে রাত্রিবেলা আমাদের একেবারে শীতে জমে যেতে দেয় না। বায়ুমণ্ডলের জন্যেই পৃথিবীর শীত গ্রীষ্ম, দিন রাত আমাদের কাছে সহনীয় হয়েছে।

এই হিসেবে পৃথিবীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চুম্বক শক্তি। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন একটা মস্ত বড় চুম্বক। মহাকাশে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার মাইল জুড়ে পৃথিবীর চুম্বকশক্তি কাজ করছে। এর ফলে পৃথিবীর চারপাশে একটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি হয়েছে। একে বলে Magnetosphere বা চুম্বকস্তর। সূর্য থেকে যে সৌরবায়ু মহাকাশে প্রবাহিত হয় তার প্রভাবে এই চুম্বকস্তরের চেহারা একটি জলবিন্দুর

মতন দাঁড়িয়েছে। এর মাঝে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবীর প্রচণ্ড চুম্বকশক্তির টান পৃথিবীর চারপাশে তুটি বন্ধনীর মত কাজ করছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Van Allen belt। সৌরবায়ুর বিদ্যুৎ কণা এই শক্তির বন্ধনীর দরুন সহজে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে না। যদি করতো তাহলে পৃথিবীর ক্ষতিই হতো। তবে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু সৌরবায়ুর বিদ্যুৎ কণা পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢুকে জ্বলে পুড়ে যায়। তখন পৃথিবীর আকাশে অপূর্ব আলোর সৃষ্টি হয়। একেই আমরা বলি অরোরা বোরিএলিস (Arora Borealis) বা মেরুজ্যোতি। উত্তর মেরু অঞ্চলেই এটা বিশেষ করে দেখা যায়। তাই দেখতে দল বেঁধে লোকে মেরু অঞ্চলে বেড়াতে যায়।

সূর্যের কাছাকাছি তিনটি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ রয়েছে—চাঁদ। চাঁদের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক এত গভীর যে চাঁদ না হলে আমাদের জোয়ার ভাঁটা হতো না। অমাবস্যা পূর্ণিমার হিসাব থাকতো না, চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ দেখা যেতো না। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার বা ২৪০০০০ মাইল। এ দূরত্ব আজ আর তেমন দূর বলে মনে হয় না। মহাকাশযানে তিন দিনেই নভোচারীরা এ দূরত্ব পাড়ি দিয়েছেন।

তবে ঘরের কাছে হলে কি হবে, পৃথিবীর সাথে চাঁদের কোথাও মিল নেই। সেখানে না আছে বাতাস, জল—না আছে গাছপালা, প্রাণী। এককালে চাঁদে বড় বড় আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার সমুদ্র ছিল। আজ সেখানে শুধু বিরাট বিরাট গর্ত পড়ে আছে।

নভোচারীরা যখন চাঁদে নেবেছিলেন তখন ভয় পেয়েছিলেন হয়তো ধূলোর সমুদ্রে তলিয়ে যাবেন। চাঁদের নির্জলা শুকনো খট্‌খটে সমুদ্র-গুলির নানা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে—সঙ্কট সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, ঝড়ের সমুদ্র আর মেঘের সমুদ্র। ওখানকার পাহাড় পর্বতের নাম দিতে গিয়ে মানুষের দেশের কথা মনে পড়ে গেছে। কাজেই চাঁদেও এ্যাপে-নাইন, কার্পেথিয়ান পিরেনিজ আর কাকসাস্ পর্বতমালা আছে। ভারতীয়রা চাঁদে গেলে কোনো একটি পর্বতমালার নাম হিমালয় হলে

আশ্চর্য হবার কিছু থাকতো না।

নভোচারীরা চাঁদে গিয়ে শুধু যে চাঁদ সম্পর্কেই নানা খবর সংগ্রহ করেছেন তা নয়, দূর থেকে আমাদের এই পৃথিবীটাকেও বিস্মিত হয়ে দেখেছেন। তারা দেখেছেন পৃথিবী যেন একটা নীল সবুজ মরকতমণি ঝকঝক করছে মহাকাশে। ১৯২৭ সালে অ্যাপোলো ১৭ নামে মহাকাশ যানটি থেকে মার্কিনীরা যে ছবি তুলেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশে সাদা মেঘের নীচে নীল সমুদ্রের মাঝে আফ্রিকা আর আরব দেশ।

এই মনোরমা সুন্দর পৃথিবী সৌরজগতে একটি অদ্বিতীয় অসাধারণ স্থান গ্রহণ করে আছে। এখন পর্যন্ত এই গ্রহটির সমতুল্য অন্য কোনো গ্রহের হদিশ মেলেনি।

॥ ৬ ॥ চাঁদ দেখে এলাম

পূর্ণিমার মস্ত গোল চাঁদের দিকে তাকালে ছোটবেলায় বৌদির মুখে শোনা কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে যায়।

"বুবুদিদি তুই চাঁদ দেখেছিস ?
উমা ডেকে কয় দিদিরে তার
পৌষের রাতে ঝিঁঝির আসরে
রিমি ঝিমি ঝিম বাজে সেতার।"
(সুনির্মল বসু)

আজকাল অবশ্য দূর থেকে চাঁদ দেখার দরকার নেই। একেবারে কাছে গিয়েই দেখা যায়। পৃথিবীর মাটির বন্ধন কাটিয়ে মানুষ মহাকাশের অন্য যে মাটিতে পা রেখেছে তা চাঁদের মাটি। ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে নীল আমস্ট্রং চাঁদের মাটিতে সবচাইতে প্রথম পা রাখেন। নীল আর্মস্ট্রং এই ঘটনাকে মানুষের এক বিরাট পদক্ষেপ বলে বর্ণনা

করেছিলেন। তাঁর পর মানুষের আরো পাঁচবার চাঁদ ঘুরে এসেছে। সেই সাথে নিয়ে এসেছে চাঁদের ধূলোবালি পাথর। এই সব ধূলো পাথর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পণ্ডিতরা চাঁদ সম্পর্কে অনেক খবর জানতে পেরেছেন। আর চাঁদে যাওয়াটা প্রায় পুরী বৃন্দাবন যাবার মতই জলভাত হয়ে গেছে।

মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ চাঁদ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছে। হিন্দুশাস্ত্রে চাঁদ হচ্ছে দেবতা—চন্দ্রদেব। প্রাচীন রোমানদের কাছে চাঁদ শিকারীদের দেবী লুনা বা ডায়না। আমরা আদর করে চাঁদকে মামা বলেও ডেকেছি। কিন্তু চাঁদ দেবতাও নয় মানুষও নয়—একটি উপগ্রহ মাত্র। আমাদের পৃথিবীর সবচাইতে কাছের একান্ত আপন উপগ্রহ।

সূর্যের কাছের গ্রহ দুটির বুধ আর শুক্রের কোন উপগ্রহ থেকে। বৃহস্পতি শনির মত অতিকায় গ্রহগুলির উপগ্রহের সংখ্যা অনেক বেশি। পৃথিবী থেকে আয়তনে ছোট মঙ্গলেরও দুটি উপগ্রহ। একমাত্র দূরতম গ্রহ প্লুটো আর পৃথিবীরই একটি করে উপগ্রহ। তবে আয়তনে প্লুটোর উপগ্রহ শ্যারন (Cahron) আর পৃথিবীর চাঁদ তাদের গ্রহগুলির থেকে খুব একটা ছোট নয়। এরজন্য পণ্ডিতরা অনেক সময় প্লুটো আর শ্যারণ পৃথিবী আর চাঁদকে ডবল গ্রহ বলে অভিহিত করেন।

মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কে হালে আমরা যে সব খবর জানতে পেরেছি সেগুলি রোবট যন্ত্রগুলির দৌলতে সম্ভব হয়েছে। একমাত্র চাঁদেই আমরা নিজেরা গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এসেছি। রুশ ও মার্কিনীদের দৌলতে চাঁদের কোথায় কি আছে, কতদূর, ওখানে যেতে কতক্ষণ লাগবে—সব খবর এখন আমরা জানি।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৪০৬৬৭৬ কিলোমিটার বা ২৫২৬৯৮ মাইল। ওখানে পৌছতে নভোচারীদের চারদিন লেগেছিল। চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটার বা ২১৫৯ মাইল। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে চাঁদের ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট সময় লাগে। ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদের একটি দিকই শুধু দেখা যায়। তবে চাঁদের

গড়ন একটু বাঁকাচোরা বলে পৃথিবী থেকে চাঁদের আর্ধেকের একটু বেশি অংশ আমরা দেখতে পাই।

চাঁদের যে অংশটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না এতদিন পর্যন্ত তা খানিকটা রহস্যময় অন্ধকার দিক বলে মনে করা হতো। এখন অবশ্য সে রহস্য ভেদ হয়েছে। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েট নভোযান লুনা ও চাঁদের তথাকথিত অন্ধকার দিকের অনেক ছবি তুলে পাঠিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে চাঁদের অন্ধকার দিকটা আসলে অন্ধকার নয়। আলোকিত দিকের মত সেদিকেও সূর্যের আলো পড়ে। এদিকে যখন অমাবস্যা ওদিকে তখন পূর্ণিমা, আর অন্যদিকে যখন অমাবস্যা এদিকে তখন পূর্ণিমার ঝলমকে আলো। তফাৎটা শুধু এই পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের পিঠে অনেক শুকনো লতার সমুদ্র রয়েছে। পৃথিবী থেকে সেগুলিকে কালো কালো দাগের মত দেখায়। অন্য পিঠে সমুদ্র তেমন নেই—রয়েছে বড় বড় পর্বতমালা।

প্রাচীন যুগের বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর আমল থেকেই মানুষ চাঁদের বিভিন্ন অংশের নানা নাম দিয়ে এসেছে—চাঁদের মানচিত্র তৈরী করেছে এইসব নাম ভারী সুন্দর। চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগ দেখে গ্যালিলিও ভেবেছিলেন ওগুলি সম্ভবত সমুদ্র। তিনি এগুলিকে মেয়ার (Mare) বা মারিয়া (Maria) আখ্যা দিয়েছিলেন। এককালে এগুলি লাভার সমুদ্র ছিল। এখানে কোনকালেই জল ছিল না। এই তথাকথিত সমুদ্রগুলির নানা ধরনের নাম যেমন Mare Nectaris বা মধুর সমুদ্রে Mare Tranquillitatis বা শান্তির সমুদ্র।

চাঁদ কিভাবে তৈরী হলো তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে একই সময়ে একইভাবে খুব সম্ভবত পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম হয়েছিল। দুটিই মোটামুটি একই উপাদানে তৈরী। তবে গোড়ার দিকে চাঁদ আর পৃথিবীর সম্পর্ক কি ছিল তা বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন গ্যাস অবস্থায় থাকাকালীন পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা থেকে একটা বড় অংশ ছিটকে বেড়িয়ে গিয়ে চাঁদের সৃষ্টি করেছিল। অনেকে আবার বলেন, একটা বড় ধরনের

উল্কার সাথে পৃথিবীর জোর ধাক্কা লেগেছিল। তার ফলে যে সব গ্যাসের টুকরো ছিটকে পড়ে—তাই জোড়াতালি দিয়ে চাঁদের তৈরী। কিছু বৈজ্ঞানিক মনে করেন পৃথিবীর মত চাঁদও একটি ছোট গ্রহ। পৃথিবীর বিষম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ধরা পড়ে গেছে।

সৃষ্টির গোড়ার থেকে চাঁদ আর পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবর্তন প্রায় একইভাবে ঘটেছে। গ্যাস অবস্থা থেকে গ্রহ এবং উপগ্রহটি ক্রমশ শীতল হয়ে জমাট বেঁধেছে। চাঁদের পৃষ্ঠদেশ জমাট বেঁধে নীরেট পাথরের কঠিন আস্তরণে পরিণত হবার পর বহুকাল পর্যন্ত চাঁদের অভ্যন্তরে আগুন জ্বলেছিল। তার থেকে আগ্নেয় গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাৎ হয়। গলানো লাভা বিরাট লাভা সমুদ্রের সৃষ্ট করে।

চাঁদের চেহারাটা যে ক্ষতবিক্ষত তার একটা কারণ চাঁদকম্প বা ভূমিকম্প। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে চাঁদের চেহারা পালটে গেছে। এদিকে দুমদাম উল্কাপাতও অনেক ঘটেছে। তার জন্য বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন ঘটেছে। এই গর্তগুলিতে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয় না বলে দূর থেকে মনে হয় চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ।

তখনো চাঁদের গায়ে হামেশাই উল্কাপাত যচ্ছে। ১১৭৮ সালে একটা বিরাট উল্কা চাঁদের গায়ে মস্তবড় গর্তের সৃষ্টি করে। লোকে বলে পৃথিবী থেকে নাকি সেই উল্কাপাত দেখা গিয়েছিল। গর্তটির নাম দেওয়া হয়েছে জিওরদানো ব্রুনো। হালে, ১৯৭২ সালেও চাঁদে উল্কাপাত হয়েছিল। ঐ উল্কাটির ওজন ছিল ২২০০ পাউণ্ড। তবে দুই একটা উল্কাপাত ছাড়া গত একশো কোটি বছরের মধ্যে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। ঘটাও মুসকিল—ওখানে না আছে বাতাস যে ঝড় বইবে; না আছে মেঘবৃষ্টি যে বন্যা হবে। নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং ওখানে যে পায়ের চিহ্ন রেখে এসেছেন, লোকে গিয়ে তা মুছে না দিল ওগুলি চিরকালের মত থেকে যাবে।

উপগ্রহ হিসেবে চাঁদ অত্যন্ত নীরেস জায়গা। ধূলোবালি ছাই কাঁকর পাথর আর গর্তে ভর্তি পৃথিবী থেকে চাঁদকে উজ্জ্বল ঝকঝকে

দেখালেও চাঁদের নিজের আকাশ অন্ধকার। এর কারণ চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। ফলে সূর্যের আলো সেখানে বিচ্ছুরিত হয় না। বায়ুমণ্ডল নেই বলে ওখানে কথা বলাও মুশকিল। নভোচারীরা যখন চাঁদে নেবেছিলেন তখন তাঁদের নিজেদের ভেতরে রেডিও মারফৎ কথা বলতে হয়েছিল। তোমরা জানো বোধহয় শব্দ বা ধ্বনি বাতাস বা ইথার যোগে একদিক থেকে অন্যদিকে যায়। সম্পূর্ণ বায়ুহীন শূন্যস্থানে কোনো শব্দ শোনা যায় না।

চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকলেও গ্যাসের হদিশ পাওয়া গেছে। ১৯৭২ সালে এ্যাপোলো-১৭-এর নভোচারীরা চাঁদের চারপাশে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন আর আরগন্ গ্যাসের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

উপগ্রহ হিসেবে চাঁদের সাথে পৃথিবীর একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এটা হচ্ছে জোয়ার ভাঁটার সম্পর্ক। পৃথিবী যেমন তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোরে চাঁদকে নিজের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে, চাঁদও তেমনি তার মাধ্যাকর্ষণের জোরে পৃথিবীর নদী সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে সেদিকে আর তার বিপরীত দিকের সমুদ্রের জল চাঁদের টানে ফুলে ফেঁপে জোয়ারের সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে—তেমনি যেখানে চাঁদের টান নেই সেখানে সমুদ্রের জল থিতিয়ে গিয়ে ভাঁটার সৃষ্টি হচ্ছে।

চাঁদ আর পৃথিবী দুই ঘুরছে বলে প্রতি ১২½ ঘণ্টা বাদে বাদে এক একটি স্থানে জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি হচ্ছে।

চাঁদ আর পৃথিবীর সম্পর্কের আরেকটা দিক হচ্ছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা। পৃথিবী যেমন নিজের চারপাশে ঘুরছে আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, চাঁদও তেমনি নিজের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এর জন্য পৃথিবী থেকে চাঁদকে সবসময় একস্থানে বা একই ভাবে দেখা যায় না। যদি এক সপ্তাহ ধরে চাঁদের দিকে নজর রাখো তাহলে দেখবে চাঁদ প্রতিদিন ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করছে— আয়তনে বাড়ছে বা কমছে। চাঁদ প্রতিদিন পূব আকাশে উদয় হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। কিন্তু রোজ এক সময়ে নয়। চাঁদ দিনে

পঞ্চাশ মিনিট করে পিছিয়ে যায়। অর্থাৎ আজ যদি সন্ধ্যা সাতটায় চাঁদ ওঠে, কাল দেখবে ৭টা ৫০ মিনিটের আগে চাঁদের দেখা নেই। চাঁদের আয়তনে বাড়া কমাকে চন্দ্রকলা (Phases of moon) বলে। অমাবস্যার সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের পিঠে সূর্যের আলো পড়ে না বলে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না। এর মানে নয় যে চাঁদ হারিয়ে গেছে। চাঁদ ঠিকই আকাশে রয়েছে—শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পৃথিবী যেমন ঘুরছে, চাঁদ যেমন স্থান পরিবর্তন করছে, চাঁদের পিঠে ধীরে ধীরে সূর্যের আলো পড়ছে—আমরাও চাঁদ দেখতে পাচ্ছি। যখন পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের পিঠ পুরোপুরি অন্ধকার তখন অমাবস্যা আর যখন পুরোপুরি সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত—তখনি পূর্ণিমা ঘটে। প্রতি সাড়ে ২৯ দিন বাদে বাদে এটা ঘটছে।

চাঁদ আর পৃথিবীর সম্পর্কের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রহণ—চন্দ্র-গ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য আর পূর্ণিমার চাঁদের মাঝে এক সরলরেখায় পৃথিবী থাকে। পূর্ণিমার চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে যেমন পৃথিবীর ছায়ার মাঝে প্রবেশ করে, সূর্যের আলো আর তার গায়ে পড়তে পারে না। ফলে উজ্জ্বল চাঁদ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। ঘণ্টা-খানেক বাদে চাঁদ যেমন পৃথিবীর ছায়া থেকে সরে যায়, চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়, আমরাও পৃথিবী থেকে আবার চাঁদকে দেখতে পাই।

সূর্যগ্রহণের সময় অমাবস্যার চাঁদ পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে এক সরলরেখায় থাকে। চাঁদ যদি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি থাকে—তাহলে হাতের বদ্ধমুষ্ঠি যেমন দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে, চাঁদও তেমনি সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। পৃথিবী থেকে আমরা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখতে পাই। কিন্তু চাঁদ যদি পৃথিবী থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকে, তাহলে পুরোপুরি সূর্যকে ঢাকতে পারে না। ফলে আমরাও বলয়গ্রহণ বা অর্ধগ্রহণ দেখি। সূর্যগ্রহণের সময় আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সূর্যের চারপাশে শুধু তার আলোর ছটা দেখা যায়। মনে রেখো খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো অত্যন্ত ক্ষতিকর—এতে অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। গ্রহণের সময়ও ধোঁয়াটে কাচ

ব্যবহার করা দরকার। সূর্যগ্রহণ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কয়েক মিনিটের মধ্যে চাঁদ যেমন সরে যায় সূর্যদেবও আবার চারদিক আলোকিত করে তোলেন।

তোমাদের আগেই বলেছি চাঁদে যাওয়াটা এখন জলভাত হয়ে গেছে। তবে ওখানে মানুষ পাঠাবার আগে বৈজ্ঞানিকরা রোবটযন্ত্র পাঠিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। এ ব্যাপারে রুশরাই অগ্রণী। তবে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে মার্কিনীরাই সর্বপ্রথম। তালিকা দেখলেই বুঝতে পারবে মানুষ কতবার চাঁদে গেছে।

১৯৫৯ সালে সোভিয়েট রোবটযন্ত্র লুনা-৩ চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই না সেদিকের ছবি তুলে পাঠায়। সেই থেকে এ পর্যন্ত মার্কিনী এবং রুশরা প্রায় চল্লিশটা রোবটযন্ত্র চাঁদে পাঠিয়েছে। প্রথম দিকের মহাকাশ অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্রগুলি শুধু চাঁদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলে পাঠিয়েছে। শেষের যন্ত্রগুলি চাঁদের চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বসিয়ে চাঁদের কোন অঞ্চলে মানুষের অবতরণ সহজ হবে সেই খবর পাঠিয়েছে।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই আমেরিকায় ফ্লোরিডার কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে নভোচারীদের নিয়ে এ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান চাঁদের উদ্দেশে রওনা হয়। ২০শে জুলাই এঁরা চাঁদে পৌছন। নভোচারী মাইকেল কলিনস এ্যাপোলো-১১তে থেকে যান। তিনি এই মহাকাশ যানটিতে চাঁদ প্রদক্ষিণ করেন। অন্য দুই নভোচারী এডুইন অলড্রিন আর নীল আর্মস্ট্রং লুনার মডিউল (Lunar Module) নামে আরেকটি ছোট মহাকাশ যানে চেপে চাঁদে অবতরণ করেন। চাঁদে এরা ২১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ছিলেন। তারপর আবার লুনার মডিউলে চেপে এঁরা নিজেদের মহাকাশযানে এ্যাপোলো-১১তে ফিরে মাইকেল কলিনসের সাথে মিলিত হন আর পৃথিবীতে ফিরে আসেন। মানুষের চাঁদে অবতরণের এই দিনটি সারা বিশ্ব তন্দ্রাহীন চোখে দেখেছিল। এই দিনটির কথা আজও আমার স্মরণে আছে। নভোচারীরা এবং রোবট যন্ত্রগুলি চাঁদের অজস্র মাটিপাথর ধুলোবালি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে

মহাকাশ যান	যাত্রী	পৃথিবীর থেকে রওনার তারিখ	চাঁদে পৌঁছনর তারিখ	কতক্ষণ চাঁদে ছিলেন
এ্যাপোলো ১১	এডউইন অলড্রিন, নীল আর্মস্ট্রং মাইকেল কলিনস্*	১৬ই জুলাই ১৯৬৯	২০শে জুলাই ১৯৬৯	২১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট
এ্যাপোলো ১২	এ্যালান বীন চার্লস কনরাড রিচার্ড গর্ডন*	১৪ই নভেম্বর ১৯৬৯	১৯শে নভেম্বর ১৯৬৯	৩১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
এ্যাপোলো ১৪	এডগার মিচেল এ্যালান শেপার্ড স্টুয়ার্ট রুসা*	৩১শে জানুয়ারী ১৯৭১	৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১	২২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
এ্যাপোলো ১৫	জেমস্ আরউইন ডেভিড স্কট এ্যালফ্রেড ওয়ারডেন*	১৬ই জুলাই ১৯৭১	৩০শে জুলাই ১৯৭১	৬৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
এ্যাপোলো ১৬	চার্লস ডিউক জন ইয়ং টমাস ম্যাটিংলি*	১৬ই এপ্রিল ১৯৭২	৩০শে জুলাই ১৯৭২	৭১ ঘণ্টা ২ মিনিট
এ্যাপোলো ১৭	ইউজিন সারনান ডঃ হ্যারিসন স্মিট রনাল্ড এভানস্*	৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২	১১ই ডিসেম্বর ১৯৭২	৭৪ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট

* এঁরা চাঁদে নামেননি। মহাকাশ যানে চাঁদের চারদিকে ঘুরেছেন। বাকি দুজন চাঁদে নেবেছেন।

এনেছে। রুশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা এখন এই নিয়ে গবেষণা করছেন।

তোমরা বলবে চাঁদে গিয়ে নভোচারীরা দেখলেন কি? চাঁদের পিঠ পাউডারের মত সূক্ষ্ম ধুলোতে ঢাকা। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর। চাঁদের মাটি আমাদের মাটির মতন নয়। পাথরের সূক্ষ্ম গুঁড়ো দিয়ে সে মাটি তৈরী। চাঁদের মাটিতে জল বা উদ্ভিদ বা প্রাণীর চিহ্ন নেই—আছে নানা ধরনের কাচের মত স্বচ্ছ নানা রঙের পাথর। উল্কাপাতের দরুণ এটা ঘটেছে।

পৃথিবীতে মানুষের যা ওজন—চাঁদে সেই ওজন দাঁড়ায় ছ'ভাগের এক ভাগ। এর কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পৃথিবীর থেকে কম। ফলে তুমদাম হাইজাম্প দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আর কিছু করার নেই। চারদিকে শুধু খা খা করছে জ্বলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া ভেঙে যাওয়া পাহাড়, গর্ত, আগ্নেয়গিরি।

চাঁদের থেকে নভোচারীরা যখন পৃথিবীর ছবি তুলেছেন তখন দেখেছেন কি সুন্দর আমাদের পৃথিবী—নীল সবুজ সাদা মেঘে ঢাকা। সেখানে জল আছে, ঘাস আছে, বন আছে—আর আছি আমরা।

॥ ৭ ॥ মঙ্গলগ্রহে প্রাণী আছে কি?

আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একটি চমকপ্রদ উপন্যাস পড়েছিলাম। উপন্যাসটির নাম ছিল 'মেঘদূতের মর্তে আগমন'। জানি না এই কাহিনীটি তোমরাও পড়েছ কিনা। [লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩। প্রকাশক।] এতে পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহ থেকে আসা একটি জীবের ছবি ছিল। মস্ত বড় মাথা, ভাঁটার মতন চোখ, রোগা লিক্‌লিকে হাত পা। যতদূর মনে পড়ছে, জীবটি এসেছিল মঙ্গলগ্রহ থেকে। এ কাহিনী কাল্পনিক হলেও মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব বহুদিন পর্যন্ত পণ্ডিতরা ফুঃ ফুঃ করে উড়িয়ে দেন নি। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বৈজ্ঞানিকরা মনে করেছেন—সৌরজগতের

কোথাও যদি প্রাণের অস্তিত্ব থাকে তাহলে একমাত্র মঙ্গলেই তা থাকা সম্ভব। একথা ভাবার একটা কারণ যে পৃথিবীর সাথে মঙ্গলগ্রহের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মঙ্গল গ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করে এসেছে। মঙ্গলের আলো বৃহস্পতি আর শুক্রগ্রহের মতো অত উজ্জ্বল না হলেও খালি চোখেই গ্রহটিকে দেখা সম্ভব। গ্রহটির রং লাল—যেন আকাশের গায়ে একটি লাল তারা। ইংরেজিতে মঙ্গলের নাম হচ্ছে Mars—প্রাচীন রোমানদের যুদ্ধের দেবতা Mars-এর নামে এই নামকরণ। গ্রহটির লালচে রং হয়তো রোমানদের যুদ্ধের রক্তপাতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত।

মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। শুক্র আর বুধের মত এটিও একটি ছোট্ট গ্রহ। এর ব্যাস হচ্ছে ৬৭৯৪ কিলোমিটার বা ৪২২০ মাইল। মঙ্গলে কোনো সমুদ্র নেই। সবটাই শুকনো ডাঙা বা স্থল, আর তার আয়তন পৃথিবীর স্থলের সমান।

মঙ্গলের একটি দিন পৃথিবীর একটি দিনের সামান্য বেশী, ঘণ্টার হিসেবে সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা। পৃথিবীর মত মঙ্গলও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু সূর্য থেকে দূরে বলে মঙ্গলের প্রদক্ষিণের পথ পৃথিবীর থেকে দীর্ঘ। পৃথিবী যেখানে ৩৬৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে সেখানে মঙ্গলের লাগে ৬৮৭ দিন। অর্থাৎ মঙ্গলের একবছর পৃথিবীর দুই বছরের সমান।

পৃথিবীর মত মঙ্গলেও ঋতু পরিবর্তন ঘটে। ওখানেও শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-হেমন্ত রয়েছে। কিন্তু বর্ষা নেই। মঙ্গলে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় না। পৃথিবীর মত মঙ্গলেও মেরু অঞ্চল আর বিষুবরেখা রয়েছে। পৃথিবীর মতই মঙ্গলের মেরুঅঞ্চল বরফে ঢাকা।

মঙ্গল আর পৃথিবী—দুটি গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থান থেকে আমরা মঙ্গলকে দেখতে পাই। পরিক্রমা পথে পৃথিবীর অবস্থান কোথায় তার ওপর মঙ্গলকে কতটা উজ্জ্বল দেখাবে তা নির্ভর করে। ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী অনেক সময় মঙ্গল আর সূর্যের

মাঝে এসে পড়ে। তখন মঙ্গলগ্রহ সূর্যের একেবারে বিপরীত দিকে অবস্থান করে—মাঝে থাকে পৃথিবী। আর সে সময়ই মঙ্গলকে সব চাইতে উজ্জ্বল আর স্পষ্ট দেখা যায়।

সাধারণত ৭৮০ দিন বাদে বাদে, অর্থাৎ দুই বছরের মত সময়ের ব্যবধানে এটা ঘটে। তবে মঙ্গলের সূর্য পরিক্রমার পথ একেবারে সগোল নয়—খানিকটা elliptical অর্থাৎ পটলের মত। তার ফলে পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব বাড়ে কমে। ১৯৭১ সালে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল। তখন পৃথিবীর থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল মাত্র ৫৬০০০০০০ কিলোমিটার বা ৩৫০০০০০০ মাইল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে সে সময় মঙ্গল পৃথিবীকে মাঝে রেখে সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করছিল বলে গ্রহটিকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। জ্যোতির্বিদরাও চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন।

একটা আবিষ্কার হচ্ছে মঙ্গলের মেরুঅঞ্চলের বরফ হেমন্তে শীতে আয়তনে বাড়তে থাকে—বসন্তে গ্রীষ্মে কমতে থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন মেরুঅঞ্চলে বরফের আয়তন কমতে থাকে তখন ওখানে একটা অদ্ভুত রং পরিবর্তন চোখে পড়ে। মেরুঅঞ্চল থেকে মঙ্গলের বিষুবরেখা পর্যন্ত এলাকার রং পাল্টে কালচে সবুজ রূপ নেয়। অনেকদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিদরা মনে করতেন মঙ্গলের মেরুঅঞ্চলের বরফ গ্রীষ্মকালে গলতে থাকে আর সেই বরফগলা জল বিষুবরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই জল পেয়ে মরুভূমিতে ঘাস পাতা শ্যাওলা জন্মায় আর তার জন্যই মরুভূমির লালচে রং বদলে কালচে সবুজ দেখায়। তোমাদের চুপিচুপি বলে রাখি পণ্ডিতদের এই ধারণা এখন ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মঙ্গলে হয়তো ঘাসপাতা গজায়, প্রাণীও আছে—একথা মনে করার আরেকটা কারণ ওখানকার আবহাওয়া। মঙ্গলের তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় কম হলেও একেবারে বেদম ঠাণ্ডা নয়। দিনের বেলা বিষুবঅঞ্চলের তাপমাত্রা আমাদের পৌষ ফাল্গুনের দুপুরের মতো। তখন তাপমাত্রা ২৫° সেন্টিগ্রেড বা ৭৭° ফারেনহাইট। তবে রাত্রিবেলা তাপমাত্রা আবার ধপ করে অনেকখানি কমে যায়। পণ্ডিতরা মনে

করতেন এই তাপমাত্রায় বড় ধরনের না হলেও নিম্ন ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব হয়তো সম্ভব। মঙ্গলের বাতাসে আমাদের মতো অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন অতটা নেই। সবটাই প্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভর্তি। এ সত্বেও ওখানকার বাতাসে যেটুকু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে তাতে এ্যামিবা জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীর বাঁচা সম্ভব। তাহলে কি মঙ্গলগ্রহে সত্যিই কোনো প্রাণী আছে ? মানুষ যতটা না প্রমাণ করতে পারে, কল্পনা করে তার থেকে অনেক বেশী। এতে অবশ্য কোন দোষ নেই, কারণ এই কল্পনা শক্তির দৌলতেই মানুষ ভবিষ্যতে আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যায়।

মঙ্গলের ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই ঘটেছিল। ১৮৭৭ সালে ইটালীর জ্যোতির্বিদ জিওভানি শিয়াপারেলি (Giovanni Schiaparelli) চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মঙ্গলের গায়ে অনেক কাটাকুটি লম্বা লম্বা দাগ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ওগুলি হচ্ছে ক্যানালি (Canali)। ইটালী ভাষায় ক্যানালি কথাটির অর্থ হচ্ছে দুই ভূখণ্ডের মাঝে জল। যেমন ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের মাঝে ইংলিস চ্যানেল। কিন্তু ইংরেজী-ভাষীরা মহা উৎসাহে স্থির করলেন ক্যানালি কথাটির অর্থ চ্যানেল নয় —এর মানে হচ্ছে ক্যানাল অর্থাৎ মানুষের কাটা খাল। মার্কিন জ্যোতির্বিদ Percival Lowell এত বেশী অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি এও বলেছিলেন—মঙ্গলে একসময় যে শুধু প্রাণী ছিল তাই নয়, তারা এত বুদ্ধিমান ছিল যে নিজেদের জলাভাব মেটাবার জন্যে মেরুঅঞ্চল থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত লম্বা লম্বা খাল কেটে জল নিয়ে গিয়েছিল। এ কল্পনা সত্যি হলে খুবই যে চমকপ্রদ হতো তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু হালের তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্রগুলির দৌলতে আমাদের সে ভুল ভেঙে গেছে। মার্কিনীরা মঙ্গলগ্রহে একের পর এক অনেকগুলি তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্র পাঠিয়েছে। এগুলির নাম হচ্ছে Mariner আর Viking। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে Mariner-5, 6 আর 7 নম্বর রোবটযন্ত্রগুলি মঙ্গলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ছবি তুলে পাঠায়। ১৯৭১ সালে Mariner-9 মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে গোটা

গ্রহটার বিভিন্ন অংশের ছবি তুলে পাঠায়। এই ছবি থেকে পণ্ডিতরা এখন মঙ্গল গ্রহের সঠিক মানচিত্র তৈরী করেছেন। এরপর ১৯৭৬ সালে ভাইকিং-১ আর ভাইকিং-২ কে মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়। এই দুটিই ছোটখাটো মহাকাশযান আর এদের ভেতর ছিল দুটি রোবট-যন্ত্র। এদের মধ্যে ১ নম্বর ভাইকিং এর রোবটযন্ত্রটি ছিল Orbiter অর্থাৎ এর কাজ ছিল মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে ছবি ও তথ্য পাঠানো। ২ নম্বর ভাইকিং এর রোবটযন্ত্রটি ছিল Lander অর্থাৎ তার কাজ ছিল মাটিতে অবতরণ করা। এই রোবটযন্ত্রটির চেহারা খানিকটা তেপায়া টেবিলের মতো আর আয়তনে ছোট্ট একটা মোটর গাড়ির মতো। যন্ত্রটি মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করার পর তিন পায়ে দাঁড়িয়ে টেলিভিসন ক্যামেরায় ছবি তুলতে পেরেছে, কিন্তু চলাফেরা করতে পারেনি। যন্ত্রটির একটি যান্ত্রিক হাত ছিল যা দিয়ে মাটি খোঁড়া যায়, মুঠো করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা যায়। যন্ত্রের ভেতরে ছিল ছোটখাটো একটি গবেষণাগার। সেখানে আবহাওয়া, জৈবিক, রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক সবরকম গবেষণাই সম্ভব। যন্ত্রটির 'মস্তিষ্ক' হিসেবে কাজ করছিল দুটি কমপিউটার। ভাইকিং-১ আর ভাইকিং-২ মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নানা খবর পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এইসব খবর আর ছবি বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা এখন বাধ্য হয়েই স্থির করেছেন, না, মঙ্গলে প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। এমনকি উদ্ভিদও নয়। আমাদের চাঁদের মতো মঙ্গলও এক মৃত জগৎ। সমস্ত গ্রহটাই একটা বিরাট মরুভূমি—কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই। জল যদি কোথাও থেকে থাকে, তা আছে মাটির নীচে। ভাইকিং-এর পাঠানো রঙিন ছবিতে দেখা গেছে গ্রহটির যেদিকে তাকাও মরুভূমির লালচে বালি—আর তাতে বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো। বালির লালচে রঙের জন্যই গ্রহটিকে দূর থেকে লাল দেখায়। তবে ভাইকিং-২ যান্ত্রিক হাতে মাটি খুঁড়ে দেখেছে—লালচে রং শুধু ওপরে। ভেতরের মাটির রং ঘন কালো। ভাইকিং-১ তোলা ছবিতে কোনো খাল দেখা যায়নি। যে লম্বা লম্বা কালো দাগ-গুলিকে পুরোনো দিনের জ্যোতির্বিদরা খাল বলে ভুল করেছিলেন,

সেগুলি খুব সম্ভবত বিরাট পর্বতমালা আর তার মাঝের গভীর খাদ। এইসব পাহাড় পর্বতের বেশীরভাগই হচ্ছে নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। এইসব আগ্নেয়গিরির উচ্চতা এত বেশী এবং এদের গহ্বর এত বিরাট যে কল্পনা করতেও ভয় হয়। মাউন্ট অলিম্পাস নামে আগ্নেয়গিরিটি উচ্চতায় ২৪ কিলোমিটার বা ১৫ মাইল—আর এর মুখের গহ্বরের বিস্তার ৮০ কিলোমিটার বা ৫০ মাইল। গোটা কলকাতা শহরটা এর ভেতর ঢুকে যেতে পারে। মঙ্গলের বিষুবরেখা অঞ্চলে যে আগ্নেয়-গিরিটি আছে—তার নাম দেওয়া হয়েছে মাউন্ট আরসিয়া। এটি আমাদের মাউন্ট এভারেস্টের তিনগুণ বেশী উঁচু আর এটির গহ্বরের বিস্তার ১৪৫ কিলোমিটার বা ৯০ মাইল মতন। এইসব আগ্নেয়গিরি থেকে মঙ্গলগ্রহে যে যুগে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে—ভেবে দেখো সে সময়টা কি ভয়াবহ ছিল।

আমেরিকার এ্যারিজোনায় গ্র্যাণ্ড্ ক্যানিয়নের নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। অনেকে হয়তো দেখেও থাকবে। ত্নপাশে বিরাট উঁচু পাহাড় মাঝে গভীর খাদ সেখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। মঙ্গলেও এরকম ক্যানিয়ন রয়েছে। তা এমন বিশাল যে আমাদের পৃথিবীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নকে তার পাশে একেবারেই তুচ্ছ মনে হবে। এর নাম হচ্ছে ম্যারিনার ভ্যালি বা মঙ্গলের উপত্যকা। এটি প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার বা ৩০০০ মাইল লম্বা। কোথাও কোথাও এই খাদ ৫ কিলোমিটার বা ৩ মাইল গভীর। কোথাও কোথাও ২৪০ কিলোমিটার বা ১৫০ মাইল চওড়া। কোটি কোটি বছর আগে হয়তো এইসব খাদ দিয়ে নদী বয়ে যেতো। মঙ্গলে খাল বা ক্যানাল আছে কিনা এই নিয়ে পণ্ডিতদের মতামতের কথা তোমাদের একটু আগেই বলেছি। ভাইকিং-এর তোলা ছবিতে খাল না দেখা গেলেও ওখানে যে একসময় খরস্রোতা নদী ছিল—তার খানিকটা আভাস মেলে। এমন অনেক জায়গা আছে যা দেখে মনে হয় একসময় ওখানে নদী বয়ে গেছে।

আজ অবশ্য মঙ্গলের পৃষ্ঠে কোথাও কোনো জল নেই। ওখানকার

মেরু অঞ্চলের বরফ কখনো গলে না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলার যে ধারণা পণ্ডিতদের ছিল—তা আসলে বরফ নয়, জমে যাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড মাত্র। প্রায় দুই বছর অন্তর অন্তর মঙ্গলে বিরাট ধূলোর ঝড় ওঠে। শ' খানেক মাইল বেগে বাতাস মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যায়। সেই সাথে উড়িয়ে নিয়ে যায় ধুলো বালি আর পাথর। ঝড় থেমে গেলে দেখা যায় যেখানে বালি ঢাকা ছিল সেখানে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, আর যেখানে পাথর ছিল, তা বালিতে ঢেকে গেছে।

ভেবে দেখো তাহলে এই ধুলোর ঝড় বওয়া মরুভূমির গ্রহে কার যাবার ইচ্ছে হবে। তবে হ্যাঁ, একটা কারণে হয়তো মঙ্গলে একবার ঘুরে আসা যায়; মঙ্গলের চাঁদ ফোবোস আর ডিমোস্‌কে দেখার জন্যে।

আমাদের একটিমাত্র চাঁদ, কিন্তু মঙ্গলের দুটি চাঁদ। দুটিই খুব ছোট্ট। দুটিই আগ্নেয়গিরির গর্তে ভরা পাথরের চাঁই। মঙ্গলের কাছের চাঁদটি হচ্ছে ফোবোস (Phobos)। এটির পরিধি ২১ কিলোমিটার বা ১৩ মাইল। এই চাঁদটি সাড়ে সাত ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। মঙ্গলের যে চাঁদ আছে তা অনেকদিন পর্যন্ত পণ্ডিতরা জানতেন না। ১৮৭৭ সালে মার্কিনী জ্যোতির্বিদ Asaph Hall মঙ্গলের চাঁদ দুটিকে আবিষ্কার করেন। তাকে স্মরণ করে ফোবোসের সব চাইতে বড় আগ্নেয়গিরির গহ্বরের নাম দেওয়া হয়েছে Hall। মঙ্গলের অন্য চাঁদটি ডিমোস (Deimos) আয়তনে ফোবোসের থেকেও ছোট। এটির পরিধি ১৫ কিলোমিটার বা ৯ মাইল। এটি প্রতি ত্রিশ ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। এই দুটি চাঁদ যখন একসাথে মঙ্গলের আকাশে উদয় হয়, তখন ভাবো তার কেমন শোভা! আর ঠিক এ জন্যই মঙ্গলে একবার অন্তত যাওয়া দরকার।

গ্রহের নাম	বুধ	শুক্র
সূর্যের তুলনায় অবস্থান	প্রথম গ্রহ	দ্বিতীয় গ্রহ
সূর্যের থেকে দূরত্ব	৫৮০০০০০০ কি.মি. ৩৬০০০০০০ মাইল	১০৮২০০০০০ কি.মি. ৬৭০০০০০০ মাইল
ব্যাস	৪৮৮০ কি.মি. ৩০৩০ মাইল	১২১০০ কি.মি. ৭৫২০ মাইল
নিজের চারপাশে ঘোরার সময়	৫৮ দিন*	১১৭ দিন
সূর্য প্রদক্ষিণের সময়	৮৮ দিন	২২৫ দিন
গাঠনিক উপাদান	পাথর	পাথর
বলয়ের সংখ্যা উপগ্রহের সংখ্যা	বলয়হীন উপগ্রহহীন	বলয়হীন উপগ্রহহীন
প্রাণের অস্তিত্ব	প্রাণহীন	প্রাণহীন
জলের অস্তিত্ব	জলহীন	জলহীন

* দিন = পৃথিবীর দিন   বছর = পৃথিবীর বছর

পৃথিবী	মঙ্গল
তৃতীয় গ্রহ	চতুর্থ গ্রহ
১৪৯৬০০০০০ কি.মি. ৯৩০০০০০০ মাইল	২২৮০০০০০০ কি.মি. ১৪২০০০০০০ মাইল
১২৭৫৬ কি.মি. ৭৯৩০ মাইল	৬৭৯৪ কিলোমিটার ৪২২০ মাইল
১ দিন (২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেঃ)	১ দিন (২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট)
৩৬৫ দিন	৬৮৭ দিন
পাথর, বরফ, জল	পাথর ও বরফ
বলয়হীন একটি উপগ্রহ : চাঁদ	বলয়হীন দুইটি উপগ্রহ ডিমোস, ফোবোস
প্রাণীবিশিষ্ট	প্রাণহীন বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন।
জলবিশিষ্ট	মাটির নীচে জলের সম্ভাবনা আছে।

বৃহস্পতি	শনি
পঞ্চম গ্রহ	ষষ্ঠ গ্রহ
৭৭৮৪০০০০০ কি.মি. ৪৮৪০০০০০০ মাইল	১৪২৫৬০০০০০ কি.মি. ৮৮৫০০০০০০ মাইল
১৪৩২০০ কি.মি. ৮৯০০০ মাইল	১২০০০০ কি.মি. ৭৫০০০ মাইল
৯ ঘন্টা ৫৬ মিনিট	১০ ঘন্টা ৪০ মিনিট
১১-১২ বছর	২৯½ বছর
জ্বলন্ত গ্যাস (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেইন, এ্যামোনিয়া)	গ্যাসীয় অবস্থা (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, এ্যামোনিয়া, মিথেইন)
বলয় আছে ১৬টি উপগ্রহ (আরও থাকা সম্ভব)	বলয় আছে ২২টি উপগ্রহ (আরও থাকা সম্ভব)
প্রাণহীন	প্রাণহীন
জলহীন	জলহীন

ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
সপ্তম গ্রহ	অষ্টম গ্রহ	নবম গ্রহ
২৮৬৭০০০০০০ কি.মি. ১৭৮০০০০০০ মাইল	৪৪৮৬০০০০০০ কি,মি. ২৭৯০০০০০০০ মাইল	৭৩৭৫০০০০০০ কি.মি. ৪৫৭২৫০০০০০ মাঃ
৫১৮০০ কি.মি. ৩২২০০ মাইল	৪৯৫০০ কি.মি. ৩০৮০০ মাইল	২২০০ কি.মি. ১৩৭৫ মাইল
১৬ ঘণ্টা	১৮ ঘণ্টা	৬ দিন ৯ ঘ. ১৮ মি.
৮৪ বছর	১৬৪ বছর	২৪৮ বছর
গ্যাসীয় অবস্থা (হাইড্রোজেন, মিথেনই হিলিয়াম)	গ্যাসীয় অবস্থা (হাইড্রোজেন, মিথেইন হিলিয়াম)	বরফ অবস্থায় (মিথেইন, পাথর)
বলয় আছে ৫টি উপগ্রহ	বলয় আছে ২টি উপগ্রহ	বলয়হীন ১টি উপগ্রহ
প্রাণহীন	প্রাণহীন	প্রাণহীন
জলহীন	জলহীন	জলহীন

॥ ৮ ॥ রাক্ষুসে গ্রহ বৃহস্পতি

সৌরজগতের সবচাইতে অতিকায় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি। গ্রহটি আয়তনে যেমনি বিরাট, এর চেহারাও তেমনি অতি ভয়ঙ্কর। অন্য সমস্ত গ্রহ আর চাঁদ একত্র করলেও বৃহস্পতির আয়তন বা ওজনের কাছাকাছি যাবে না। গ্রহটি যেমন বড়, তেমনি ভারী। আর এজন্যই খালি চোখে গ্রহটিকে খুঁজে বার করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। শুক্রগ্রহ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সামান্য আগে পরে ছাড়া গ্রহটিকে দেখা সম্ভব না। সেখানে রাতের আকাশে চোখ মেললেই দেখা মিলবে বৃহস্পতির—ঝক্‌ঝক্ করছে বিরাট এক তারা।

বৃহস্পতি অবশ্য তারা নয় গ্রহ মাত্র। গ্রহটি আয়তনে এত বড় বলে এর ওপর অনেকখানি স্থান জুড়ে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়। ফলে গ্রহটিকে এত উজ্জ্বল দেখায়। বৃহস্পতির আকাশ একেবারে মেঘে ঢাকা বলে সূর্যের আলো এর ওপর বেশী প্রতিফলিত হয়। গ্রহটির ঔজ্জ্বল্যের এটাও একটা কারণ।

বৃহস্পতি হচ্ছে সৌরজগতের পঞ্চমগ্রহ। তবে মঙ্গল থেকে রওনা হলেই যে বৃহস্পতিতে পৌঁছবে তা নয়। পথে গ্রহাণুপুঞ্জ বা Asteroid-দের সাথে দেখা হবে। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে ছড়িয়ে আছে ছোট বড় মাঝারি আকারের কয়েক লক্ষ পাথরের চাঁই। তোমাদের আগেই বলেছি, অনেকদিন পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল এগুলি একটি বড় গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। এখন সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ছোট বড় পাথরের টুকরো একত্র করলে তাদের ওজন আমাদের চাঁদের থেকেও কম হবে। এদের মধ্যে সব চাইতে বড় এ্যাস্টিরয়েডটির নাম হচ্ছে সেরাস (Ceres)। পণ্ডিতরা মনে করেন সূর্য যে সময় সৃষ্টি হয়েছিল এই গ্রহাণুপুঞ্জও সেই সময়ের। অর্থাৎ প্রায় ৫০০০০০০০০০-

বছর আগে এদের সৃষ্টি হয়। প্রথমে গ্যাস অবস্থায় ছিল। পরে নিরেট পাথরে পরিণত হয়। অন্য গ্রহদের মত গ্রহাণুপুঞ্জও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু কি পথে ঘুরছে সেই অনুসারে এদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে—তাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন এ্যাপোলো (Apolo), হিডালগো (Hidalgo) এ্যামর (Amor)। পণ্ডিতরা অনুমান করেন ভবিষ্যতে এ্যাপোলো গোষ্ঠীর গ্রহাণুপুঞ্জ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কক্ষপথের খুব কাছাকাছি এসে পড়বে। তখন হয়তো রোবটযন্ত্র পাঠিয়ে এই ১০-১২ মাইল লম্বা পাথরের চাঁই-এর ওপর মহাকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে। দড়ি বেঁধে দু-একটা টুকরো পৃথিবীর উপগ্রহের পথেও হয়তো নিয়ে আসা যাবে। থাক সেসব ভবিষ্যতের কথা। আপাতত গ্রহাণুপুঞ্জদের পেছনে ফেলে চলো যাই বৃহস্পতিতে।

প্রাচীনকালে রোমান দেবদেবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল জুপিটারের। গ্রহদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশাল এই গ্রহটির তাই নাম দেওয়া হয়েছিল জুপিটার। জুপিটার বা বৃহস্পতি সূর্যের থেকে দূরত্বে পঞ্চম স্থানে আছে। সূর্যের কাছের চারটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী আর মঙ্গল আয়তনে ছোট। সৃষ্টির গোড়ার দিকে—এই গ্রহগুলি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড অবস্থায় থাকলেও এখন নিভে গিয়ে নীরেট পাথরে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। অন্য তিনটি গ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে জ্বলন্ত আগ্নেয়-গিরি আর দেখা যায় না। তাতে মনে হয় বুধ, শুক্র আর মঙ্গলের ভেতরে এখন আর জ্বলন্ত পাথরের কোনো স্তর নেই।

অন্যদিকে বাদবাকি পাঁচটি গ্রহ এখনও গ্যাস অবস্থায়। এগুলি এখনো জমাট বাঁধেনি। বৃহস্পতি এই পাঁচটির একটি।

দূর থেকে চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে বৃহস্পতির রঙিন মেঘে ঢাকা চেহারাটাই শুধু চোখে পড়ে। কিন্তু ঐ মেঘের নীচে বৃহস্পতি এখনও জ্বলন্ত গ্যাসের একটি পিণ্ড। সবকিছু ওখানে টগবগ করে ফুটছে। অনুমান করা হয়, হয়তো গ্রহটির কেন্দ্রস্থল কঠিন পাথর আর লোহায়

তৈরী। এটুকু ছাড়া বৃহস্পতির বাদবাকি অংশ খুব সম্ভবত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। বৃহস্পতির মেঘে নানা ধরনের গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার ভেতরে মিথেইন, অ্যামোনিয়া আর জলীয় বাষ্প রয়েছে।

আগেই বলেছি বৃহস্পতির আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। এই মেঘের আবরণ খুব ঠাণ্ডা। এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ১৩০° সেন্টিগ্রেড বা মাইনাস ২০০° ফারেনহাইট। এই মেঘের স্তরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঝড় বইছে। এই মেঘের চাদর ভেদ করে যতই নীচে নামবে ততই উত্তাপ বাড়বে। বৃহস্পতির একেবারে কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ Core-এর তাপমাত্রা হয়তো ৩০০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৫৩০০০° ফারেনহাইট মতন।

বৃহস্পতির সবচাইতে আশ্চর্য দৃশ্য হচ্ছে ওর গায়ে রক্তচক্ষুর মত একটা লাল দাগ। এই লাল দাগটা চিরকাল ছিল না। মাত্র গত তিনশো বছর ধরে এই দাগটা দেখা যাচ্ছে। দাগটা আবার ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে। তোমরা প্রশ্ন করবে আচ্ছা এই দাগটা কিসের দাগ? এটা আসলে বৃহস্পতির মেঘে ঢাকা আকাশে এক বিরাট ঘূর্ণী ঝড়। প্রতি ছয়দিনে এই ঝড় গোটা গ্রহটাকে একবার চক্কর দিয়ে আসছে। আর এজন্যই মনে হয় দাগটা স্থান পরিবর্তন করছে। এই দাগ বা ঘূর্ণী ঝড়ের আয়তন বিরাট। এটা প্রায় ৯০০০ মাইল বা ১৪০০০ কিলোমিটার চওড়া আর ২৫০০০ মাইল বা ৪০০০০ কিলোমিটার লম্বা। তাহলেই বোঝো কতখানি জায়গা জুড়ে এই ঝড় বইছে। আমাদের পৃথিবীর আয়তন এর থেকে অনেক কম। জ্যোতির্বিদরা দেখেছেন এই ঝড়ের আয়তন, ঔজ্জ্বল্য আর রং ক্রমাগত পালটাচ্ছে। টেলিস্কোপ দিয়ে বৃহস্পতির এই রক্তচক্ষুর মত দাগ আর মেঘ অতি সহজেই চোখে পড়ে।

সূর্যের থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব ৭৭৮৪০০০০০ কিলোমিটার বা ৪৮৪০০০০০০ মাইল। এর ব্যাস হচ্ছে ১৪৩২০০ কিলোমিটার বা ৮৯০০০ মাইল। সূর্য থেকে অনেক দূরে বলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে

বৃহস্পতির লাগে প্রায় ১১ থেকে ১২ বছর। তবে গ্রহটির নিজের চারদিকে ঘুরতে খুব কম সময় লাগে—মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট।

বহুদিন পর্যন্ত বৃহস্পতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা খুব একটা খবর জানতেন না। তবে হালে তথ্য অনুসন্ধানী মহাকাশ যানগুলি বৃহস্পতির পাশ দিয়ে যাবার সময় রোবটযন্ত্রের সাহায্যে বেশ কিছু তথ্য আর ছবি তুলে পাঠিয়েছে। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে পাইওনীয়ার-১০ আর পাইওনীয়ার-১১।

বৃহস্পতির অনেক ছবি তুলে পাঠায় ১৯৭৯ সালে ভয়েজার-১ (Voyager-1) আর ভয়েজার-২। একেবারে কাছের থেকে বৃহস্পতির প্রায় ৩৩ হাজার ছবি তুলে পাঠায়। এই ছবিগুলি এত চমকপ্রদ যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই ছবিতে দেখা গেছে যে বৃহস্পতির আকাশে সমস্ত সময় প্রবল ঝড় বইছে—লাল সাদা কালো মেঘের প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে।

ভয়েজারের পাঠানো ছবির দৌলতে আমরা বৃহস্পতি সম্পর্কে আরো একটি নতুন খবর জানতে পেরেছি। শনিগ্রহের মত বৃহস্পতিরও বলয় আছে। এই বলয় অজস্র ছোটবড় পাথর আর ধুলোতে তৈরী। এগুলি বৃহস্পতির চারদিকে বিপুল বেগে ঘুরছে। এই ধুলো আর পাথরের ওপর সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়। তার ফলে মনে হয় বৃহস্পতির চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। শনিগ্রহের বলয় যেমন সহজেই চোখে পড়ে, বৃহস্পতির বলয় পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। বলতে কি, বৃহস্পতিরও যে বলয় আছে ভয়েজার-২ ছবি না পাঠানো পর্যন্ত আমরা তা জানতে পারিনি। মহাকাশ ভ্রমণকারী এই রোবট-যন্ত্রটি বৃহস্পতিকে পেছনে ফেলে যাবার সময় পিছু ফিরে সূর্যের আলোর পটভূমিতে যে ছবি তুলেছে তাতে এই বলয় স্পষ্ট দেখা গেছে। এমনকি বৃহস্পতির মেরুঅঞ্চলে অরোরা বোরিয়েলিসের যে আলোর খেলা চলছে। তারো ছবি তুলেছে।

তোমরা জানো বোধহয় আমাদের পৃথিবীর মেরুঅঞ্চলের দেশগুলি—নরওয়ে সুইডেন থেকেও এই অরোরা বোরিয়েলিসের আলো দেখা যায়।

পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান প্রচণ্ড বেশী। ধরো কারুর ওজন যদি ৫০ কিলোগ্রাম হয়, তাহলে বৃহস্পতিতে তা ধাঁ করে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১১৭ কিলোগ্রাম। এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে একেবারে গোড়াতে বৃহস্পতি যে ধরনের জ্বলন্ত গ্যাস দিয়ে তৈরী হয়েছিল, তার কিছুই আজ পর্যন্ত গ্রহটিকে ছেড়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে পারেনি। এদিক থেকে বৃহস্পতির সাথে সূর্যের প্রচণ্ড মিল রয়েছে। দুটিই প্রধানত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন বৃহস্পতি যদি আকারে আর একটু বড় হতো তাহলে গ্রহ না হয়ে সূর্যের মতই একটি তারাতে পরিণত হত।

তারা হোক বা না হোক সূর্যের মত বৃহস্পতিরও বেশ কিছু জুটিদার আছে। এগুলি হচ্ছে বৃহস্পতির উপগ্রহ। এখন পর্যন্ত বৃহস্পতির ১৬টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি একেবারে হালে—ভয়েজার মিশনের দৌলতে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনেহয় বৃহস্পতির আরো কয়েকটি উপগ্রহ থাকা একেবারেই অসম্ভব নয়। বৃহস্পতির উপগ্রহের মধ্যে চারটি আয়তনে বিরাট। সেগুলি পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে অনায়াসেই দেখা যায়। যদি দেখো, তাহলে দেখবে বৃহস্পতির চারপাশে যেন চারটি আলোর বিন্দু। পণ্ডিতরা মনে করেন এই চারটিই বৃহস্পতির আদি উপগ্রহ, সৃষ্টির সময় থেকেই এগুলি রয়েছে। বৃহস্পতি থেকে এই চারটি উপগ্রহ খুব একটা দূরে নয়। পণ্ডিতরা বলেন দূরের উপগ্রহগুলি হয়তো এ্যাস্টিরয়েড। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রচণ্ড টানে নিজেদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেড়িয়ে এসে এখন বৃহস্পতির চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে।

ভয়েজার মিশনের দৌলতে আমরা বৃহস্পতির চারটি বড় উপগ্রহ সম্পর্কে অনেক খবর জানতে পেরেছি। এখানে তোমাদের বলে রাখি এই চারটি উপগ্রহকে বলা হয় 'গ্যালিলিওর চাঁদ'। ১৬১০ সালে ইটালীর জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও দূরবীনের সাহায্যে সর্বপ্রথম এই চাঁদগুলি আবিষ্কার করেন। এই চারটি চাঁদের নাম হচ্ছে আইও (IO),

ইয়োরোপা (Europa), গ্যানিমিড্ (Ganymede) আর ক্যালিস্টো (Callisto)। আইও আর ইয়োরোপা আয়তনে আমাদের চাঁদের সমান। গ্যানিমিড্ আর ক্যালিস্টো বুধগ্রহের থেকেও আয়তনে বড়। আইওর ব্যাস হচ্ছে ৩৬৩৬ কিলোমিটার বা ২২৫৯ মাইল। বৃহস্পতি থেকে আইওর দূরত্ব হচ্ছে ৪২২০০০ কিলোমিটার বা ২৬২০০০ মাইল। এই উপগ্রহটি প্রায় ১½ দিনে বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এটিই বৃহস্পতির সবচাইতে কাছের উপগ্রহ। উপগ্রহ হিসেবে আইও খুবই চমকপ্রদ। পৃথিবীর মত এখানেও জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। এই-সব আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝেমধ্যেই অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। ভয়েজার থেকে পাঠানো ছবিতে দেখা গেছে আইওর আগ্নেয়গিরি থেকে লাল, কমলা রঙের সালফিউরিক গ্যাস প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার জন্যই আইওর রং এত উজ্জ্বল—যেন হলদে লাল কমলা রঙের একটি বল। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির কালো কালো গহ্বর। বৃহস্পতির কাছে বলে বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আইওর বুকে প্রচণ্ড জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই জোয়ার-ভাঁটা জলের নয়, গলিত লাভার। পণ্ডিতদের অনুমান আইওর ভূপৃষ্ঠ মাত্র ১০০০০০০০ বছরের পুরোনো। মহাকাশের সময়ের তুলানায় এটা খুব একটা বেশি দিনের কথা নয়।

আইওর ভূপৃষ্ঠ জমানো সালফার ডাই-অক্সাইড আর সালফারে তৈরী। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এই উপগ্রহটির কেন্দ্রস্থলে হয়তো তরল সিলিকেট আছে। এদিক থেকে পৃথিবীর সাথে খানিকটা মিল আছে। পৃথিবীর ভেতরে যেমন আগুন, আইও-রও খুব সম্ভবত তাই রয়েছে।

আইও যেমন জ্বলন্ত উপগ্রহ, ইয়োরোপা তেমনি নিভে যাওয়া উপগ্রহ। ইউরোপার ওপরের অংশটা বরফে তৈরী আর ভেতরে রয়েছে কঠিন পাথর। দূর থেকে ইউরোপাকে দেখায় যেন মসৃণ একটা বল। শুধু তার ওপর অজস্র কাটাকুটি দাগ। এই দাগগুলি কিসের তা এখনও জানা যায়নি। এগুলি ফাটলও নয়। পাহাড় বা উপত্যকাও

নয়। ইয়োরোপাতে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই, তবে খুব উঁচু পাহাড় আছে। ইয়োরোপার ব্যাস ৩০৬৬ কিলোমিটার বা ১৯০৫ মাইল। বৃহস্পতি থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ৬৭১৪০০ কিলোমিটার বা ৪১৭২০০ মাইল।

গ্যানিমিড্ বৃহস্পতি থেকে দূরত্বের হিসেবে তৃতীয়স্থান অধিকার করে আছে। সৌরজগতে এটিই সব চাইতে বিরাট উপগ্রহ। এর ব্যাস হচ্ছে ৫২১৬ কিলোমিটার বা ৩২৪১ মাইল। বৃহস্পতি থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ১০৭১০০০ কিলোমিটার বা ৬৬৬০০০ মাইল। আমাদের চাঁদের মত গ্যানিমিডের পৃষ্ঠদেশ বড় বড় গর্তে ভর্তি। এর বেশ খানিকটা অংশ আলোহীন অন্ধকার। পণ্ডিতদের ধারণা এই অংশগুলি খুবই প্রাচীন, প্রায় ৪০০০০০০০০০ বছরের পুরোনো। যে অংশটাতে আলো পড়ে সে অংশে বড় বড় ফাটল, পাহাড় রয়েছে। গ্যানিমিডের ভূ-পৃষ্ঠ বরফে তৈরী, স্থানে স্থানে পাথর অনাবৃত হয়ে পড়েছে। গ্যালিলিওর চারটি চাঁদের মধ্যে ক্যালিস্টো বৃহস্পতির থেকে সব চাইতে দূরে। এই দূরত্ব হচ্ছে ১৮৮৪ ০০০ কিলোমিটার বা ১১৭১০০০ মাইল। ক্যালিস্টোর ব্যাস হচ্ছে ৪৮৯০ কিলোমিটার বা ৩০৩৯ মাইল। প্রায় ৪০০০০০০০০০ বছর আগে ক্যালিস্টোর পৃষ্ঠদেশে এত দুমদাম উল্কাপাত হয়েছিল যে এই উপগ্রহটির চেহারা দাঁড়িয়েছে আমাদের বুধগ্রহ বা চাঁদের মতন।

ক্যালিস্টোর ওপরের অংশও বরফে ঢাকা। স্থানে স্থানে পাথর বার হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রস্থলে আছে জমানো বরফ আর কঠিন পাথর। তোমাদের আগেই বলেছি আইও, ইয়োরোপা, গ্যানিমিড্ আর ক্যালিস্টো ছাড়াও বৃহস্পতির আরো অনেক উপগ্রহ আছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো আবিষ্কৃত হবে। বুঝতেই পারছো সৌরজগতে বৃহস্পতি হচ্ছে গ্রহদের রাজা। ১৬টি জানা উপগ্রহ নিয়ে এই অতিকায় রাক্ষুসে গ্রহটি রাতের আকাশে জ্বল জ্বল করছে। চোখ মেললেই দেখতে পাবে।

॥ ৯ ॥ শনির বলয়

সৌরজগতের অন্য গ্রহদের তুলনায় শনির চেহারা যে খানিকটা অদ্ভুত, জ্যোতির্বিদরা অনেককাল আগের থেকেই একথা জানতেন। ১৬১০ সালে ইটালীর জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে শনিগ্রহের দুপাশে কানের মতন কী যেন একটা জিনিস আছে। পরবর্তীকালের জ্যোতির্বিদরা আরো জোরালো দূরবীন দিয়ে দেখতে পান যে গ্রহটির চারপাশে হাতের বালার মতন উজ্জ্বল চকচকে একটা চাকতি ঘুরছে। এরপর ১৬৫৫ সালে ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ ক্রিস্টিয়ান হুইগানস (Christian Huygens) নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে শনি গ্রহের চারপাশে বলয় রয়েছে। এরও বিশ বছর বাদে জ্যঁ্যা ডমিনিক ক্যাসিনি বলেন বলয় একটা নয়, অনেকগুলি, আর এই বলয়গুলির মধ্যে বড় বড় ফাঁক আছে। ক্যাসিনির নাম অনুসারে পরবর্তীকালে সবচাইতে বড় ফাঁকটার নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাসিনি-ভেদ (Cassini Division)। এখন অবশ্য মহাকাশ অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্রের দৌলতে শনি আর তার বলয় সম্পর্কে আমরা অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। ১৯৮১ সালে ভয়েজার-১ শনিগ্রহের ও তার বলয়ের অত্যাশ্চর্য সব ছবি তুলে পাঠিয়েছে। পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে তা কোনদিনই দেখা সম্ভব ছিল না।

তবে একটা কথা পণ্ডিতরা অনেকদিন আগের থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। বলয়গুলি আর যাই হোক না কেন নিরেট কঠিন পাথরের চাকতি নয়। তা যদি হতো তাহলে শনির মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টানে তা অনেককাল আগেই ভেঙে চৌচির হয়ে যেত। বলয়গুলি হয়তো ছোট ছোট কোন জিনিসে তৈরী। ভয়েজারের ছবির দৌলতে এখন আমরা জানতে পেরেছি যে বলয়গুলি অজস্র ছোট বড় বরফে ঢাকা পাথর আর বরফের টুকরো দিয়ে তৈরী। এই পাথর আর

বরফ কোথাও ধুলিকণার মতো ক্ষুদ্র, কোথাও বা বেশ কয়েক মিটার লম্বা চওড়া। এগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির থেকে আলাদা, জমাট বেঁধে নেই। এই পাথর ধুলো আর বরফের চাঁই শনির চারপাশে বন বন করে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার আলাদা লাইনে ভাগ হয়ে গেছে। একের গতিপথ অন্যের গতিপথ ছেদ করে চলে গেছে। দূর থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে পাথরের টুকরোগুলিকে আলাদা করে দেখা যায় না। তবে বরফের ওপর সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে মনে হয় শনির চারদিকে একটা আলোর চাকতি ঘুরছে।

তোমাদের আগেই বলেছি বলয় একটা নয় বেশ কয়েকটা। বড় বড় বলয়ের মধ্যে আবার হাজার হাজার ছোট ছোট বলয়ের রেখা রয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন তিনটি প্রধান বলয় রয়েছে আর ইংরেজি বর্ণ অনুসারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে A-Ring, B-Ring আর C-Ring। সবচাইতে বাইরের দিকের প্রধান বলয়টি হচ্ছে A-Ring। এটি ১৫০০০ কিলোমিটার বা ৯০০০ মাইল লম্বা। এই বলয়টির পর রয়েছে বেশ চওড়া খানিকটা অন্ধকার ফাঁক যার নাম ক্যাসিনি ভেদ। ক্যাসিনি ভেদ প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার বা ২৫০০ মাইল লম্বা। এরপর B-Ring। এই বলয়টি খুব উজ্জ্বল আর সব চাইতে চওড়া। এই বলয়টির মধ্যে আবার সাইকেলের চাকার স্পোকের মত সরু সরু লম্বা লম্বা দাগ রয়েছে। বলয়ের সাথে এই দাগগুলিও ঘুরছে।

B-Ring-এর পর হচ্ছে অস্বচ্ছ C-Ring। শনির এই তিনটি প্রধান বলয়ের মধ্যে যে সব পাথর আর বরফের টুকরো ঘুরছে সেগুলি সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। কোথাও বেশী কোথাও কম। এগুলি আবার হাজার হাজার সরু সরু হাতের চুড়ির মতো বলয়ের সৃষ্টি করেছে। ফলে শনির বলয়ের মোট চেহারাটা দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। সারা গায়ে সরু সরু গোল গোল দাগ কাটা।

মহাকাশ যন্ত্র পাইওনীয়ার-১১ আর ভয়েজার-১ ও ভয়েজার ২ এর দৌলতে আরো কয়েকটি নতুন বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে। অস্বচ্ছ C-Ring-এর পরে রয়েছে D-Ring। এটি একেবারে শনিগ্রহের

আকাশে মেঘের স্তর পর্যন্ত পৌঁচেছে। অন্যদিকে বাইরের A-Ring ছাড়িয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে আরো তিনটি বলয়ের F-Ring, G-Ring আর E-Ring। F-Ring খুব সরু। এই বলয়টির পাথর আর বরফের টুকরোর ঘূর্ণায়মান গতিপথে প্যাঁচ খেয়ে গেছে। ফলে চেহারাটা দাঁড়িয়েছে চুলে বাঁধা বেণীর মতো। বাকি দুটি বলয় G আর E অস্বচ্ছ। এগুলি অনেকখানি স্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আগে পণ্ডিতরা মনে করতেন বলয়গুলির মাঝে যে ফাঁক আছে তা শূন্যস্থান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভয়েজারের পাঠানো ছবিতে দেখা গেছে সেখানেও বলয় রয়েছে।

তোমরা ভাবছো, এই পাথর আর বরফের টুকরো শনির মাধ্যাকর্ষণের টানে বলয় ছেড়ে ছিটকে বেড়িয়ে যায় না কেন? শনির পিঠে এগুলির তো দুমদাম আছাড় খাবার কথা। কেন যে এটা হয় না তার কারণ হচ্ছে বলয়গুলির মাঝে ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি উপগ্রহ। এই উপগ্রহগুলির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শনির মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কাজ করছে বলে দুই টানের মাঝে পড়ে বলয়ের পাথর, বরফ, ধুলো, বালি যে যার স্বস্থানে ঘুরছে, এদিক ওদিক করতে পারছে না। জ্যোতির্বিদরা এদের নাম দিয়েছেন Shepherd Sattelite বা রাখাল উপগ্রহ। এরা বলয়ের বরফের আর পাথরের মেঘপালকে স্বস্থানে রেখেছে। A-Ring-এ এরকম একটি উপগ্রহ আছে। সেটি মাত্র ৩০ কিলোমিটার বা ২০ মাইল চওড়া। F-Ring-এ দুপাশে দুটি রাখাল উপগ্রহ আছে। এই দুটি উপগ্রহের আকর্ষণের দরুনই সম্ভবত F-Ring-এর অমন বেণী-পাকানো চেহারা দাঁড়িয়েছে।

খালিচোখে শনির বলয় দেখা না গেলেও একটা ছোটখাটো দূরবীন যদি জোগাড় করতে পারো তাহলেই দেখতে পাবে। শনির সূর্য পরিক্রমার পথের প্রেক্ষিতে এই বলয় খানিকটা বাঁকা হয়ে আছে বলে দূর থেকে দূরবীন দিয়ে কখনো শুধু এর একটা ধার বা কিনারা, কখনো বা পুরোপুরি চওড়া দিকটা দেখা যায়। সূর্যকে ঘুরে আসতে শনির লাগে ২৯½ বছর। এই ২৯½ বছরে পৃথিবী থেকে বলয়গুলিকে

নানাভাবে দেখা যায়। তবে এই দীর্ঘসময়ের মাঝে মাত্র দুবার বলয়গুলির সম্পূর্ণ প্রস্থ ও বিস্তার দেখা সম্ভব। তখন উজ্জ্বলতাও অনেক বেড়ে যায়। ১৯৮৮-র পর ২০০৩ সালে এটা ঘটবে। খুব বেশীদিন আর বাকি নেই।

বলয় ছেড়ে এবারে এসো বলয়ধারী শনি গ্রহের দিকে নজর দিই। সৌরজগতে শনি হচ্ছে ষষ্ঠ গ্রহ, কিন্তু আয়তনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। গ্রহটির আরেকটি নাম হচ্ছে Saturn। প্রাচীন রোমানদের কাছে Saturn ছিলেন কৃষিদেবতা। মনে রেখো এর সাথে তথাকথিত শয়তান বা Satan-এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও বাংলায় চলতি কথায় 'শনি গ্রহ' বলতে আমরা অনেক সময় 'অশুভ প্রভাব' বোঝাই। কিন্তু সৌরজগতের এই আশ্চর্য গ্রহটি শুভও নয় অশুভও নয়। একটি গ্রহ মাত্র।

বৃহস্পতির মত শনিও অতিকায় বিশাল গ্রহ। এই গ্রহটির ভেতর ৭৫৮টা পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু বড় হলে কি হবে, শনির ঘনত্ব খুব কম, ওজনে হাল্কা উপাদানে তৈরী। একটা বিশাল সমুদ্রে শনিকে ফেলে দিলে ডুববে না, বলের মতন ভাসবে। কিন্তু পৃথিবীকে ফেললে ভুস্ করে ডুবে যাবে।

বৃহস্পতির মতো শনিও এখনো প্রায় পুরোপুরিই গ্যাস অবস্থায় আছে। শনির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরি। তার নীচে আছে তরল হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের সমুদ্র। এখানে চাপ এতো বেশী যে গ্যাস প্রায় ধাতুতে পরিণত হয়েছে। এর পরের স্তরে রয়েছে তরল এ্যামোনিয়া আর মিথেইন। এরপর একেবারে কেন্দ্রস্থলে তরল পাথর আর লোহা। কেন্দ্রস্থলটির আয়তনই পৃথিবীর সমান।

শনির হাইড্রোজেন স্তরে যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে শনির চুম্বকশক্তি বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। চুম্বকশক্তিতে পৃথিবী আর বৃহস্পতির পরই শনির স্থান। এই চুম্বকশক্তির টান যে কি প্রচণ্ড তা গ্রহটির থেকে প্রায় ২০০০০০০ কিলোমিটার বা ১০০০০০০ মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যায়।

সূর্য থেকে শনি ১৪২৫৬০০০০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৮৮৫০০০০০০ মাইল দূরে। গ্রহটির ব্যাস হচ্ছে ১২০০০০ কিলোমিটার বা ৭৫০০০ মাইল। সূর্য পরিক্রমা করতে শনির ২৯½ বছর লাগলে কি হবে; নিজের অক্ষরেখার চারদিকে মাত্র দশঘণ্টা চল্লিশ মিনিটেই একবার ঘুরে আসতে পারে। তার মানে হচ্ছে শনির একটি দিন আমাদের আধখানা দিনেরও কম। অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে চা বিস্কুট খেতে খেতেই আবার রাতের খাবার সময় হয়ে যাবে।

শনি গ্যাস অবস্থায় আছে বলে আর দ্রুত ঘোরার ফলে এর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল চ্যাপ্টা। খানিকটা কমলালেবুর মতো। শনির পৃষ্ঠদেশ প্রায় বৃহস্পতির মতো। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা গেছে গ্রহটির বিষুবরেখার সাথে সমান্তরালে সারা গায়ে উজ্জ্বল আর অন্ধকার দাগ। সময়ে সময়ে এই দাগগুলির রং পাল্টে যায়। এগুলি হচ্ছে মেঘ। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া এই মেঘগুলিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বিষুবরেখা অঞ্চলেই ঝড় বইছে বেশী। এখানে ঝড়ের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার বা ১১০০ মাইল। বৃহস্পতির ঝড়ের গতির প্রায় চারগুণ বেশী। বৃহস্পতির আকাশে ঝড়ের ফলে যেরকম ডিম্বাকৃতি রক্তচক্ষুর সৃষ্টি হয়েছে শনির আকাশেও তেমনি রক্তচক্ষু রয়েছে। তবে বৃহস্পতির মত অমন চোখ ঝলসানো চমকপ্রদ নয়।

শনির আকাশে যে প্রবল ঝড় বইছে তা গ্রহটির অভ্যন্তরীণ তাপের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে শনির গায়ে সাদা কালো গোল গোল দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। বড়-জোর সপ্তাহখানেক। এছাড়া শনির গায়ে তার অজস্র চাঁদ আর বলয়ের ছায়া পড়েও কালো কালো দেখায়। শনির বায়ুমণ্ডলে মেঘের ওপর তাপমাত্রা অত্যন্ত কম—মাইনাস ১৯০° ডিগ্রি বা মাইনাস ৩০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট মতন। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের মত শনির মেরু অঞ্চলেও অরোরা বেরিএলিশ দেখা যায়।

উপগ্রহের সংখ্যার দিক থেকেও বৃহস্পতির সাথে শনির মিল আছে। বৃহস্পতির যদি ১৬টি উপগ্রহের সন্ধান মিলে থাকে শনির মিলেছে

২২টির। ভাইজার আর অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধানী রোবট যন্ত্রগুলি এই ২২টি উপগ্রহের সন্ধান না দেওয়া পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল শনির মাত্র ১০টি উপগ্রহ রয়েছে। জ্যোতির্বিদরা এদের নাম দিয়েছিলেন—জানুস (Janus), মাইমাস (Mimas), এনসিল্যাডাস (Enceladus), টেথিস (Tethys), ডিয়ন (Dione), রিয়া (Rhea), টাইটান (Titan), হাইপারিয়ন (Hyperion), ইয়াপেটাস (Iapetus), আর ফোব্ (Phoebe)। এই দশটি উপগ্রহের সন্ধান শ' চারেক বছর আগের থেকেই পণ্ডিতরা জানতেন। তাই এদের নামও সুন্দর সুন্দর। গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীদের নাম অনুসারে। কিন্তু হালে যে সমস্ত উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে জ্যোতির্বিদরা বেরসিকের মতো তাদের নাম দিয়েছেন—১৯৮০ শনি-১, ১৯৮০ শনি-৩, ১৯৮০ শনি-৪, ইত্যাদি। তবে পুরোনো দশটিই প্রধান উপগ্রহ। হালের জানা উপগ্রহগুলি ছোট ছোট।

শনির উপগ্রহের মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে টাইটান। এটি বুধের চাইতেও বড়। বৃহস্পতির চাঁদ গ্যানিমিড্ সৌরজগতের উপগ্রহের মধ্যে আয়তনে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিতীয় স্থানটি হচ্ছে শনির চাঁদ টাইটানের। টাইটান ৫১৫০ কিলোমিটার বা ৩২০০ মাইল চওড়া। তবে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে সমস্ত চাঁদদের মধ্যে একমাত্র টাই-টানেরই বায়ুমণ্ডল রয়েছে। তবে এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে হাল্কা। এই বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন, মিথেইন আর ইথেইন গ্যাসে তৈরী। এই বিশেষ গ্যাসের জন্য দূর থেকে টাইটানকে রক্তিম দেখায়। পণ্ডিতরা মনে করেন টাইটানের পৃষ্ঠদেশ পাথর আর বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে হয়তো তরল নদী বা হ্রদ রয়েছে। তবে সেটা তরল গ্যাসের হবে। জল হয়তো নয়। শনির থেকে টাইটানের দূরত্ব ১২২১৪৬০ কিলো-মিটার অর্থাৎ ৭৫৮৬০০ মাইল।

শনির চাঁদদের মধ্যে সবচাইতে দূরে হচ্ছে ফোব্ (Phoebe)। এটি শনি থেকে ১২৯৫৪০০০ কিলোমিটার বা ৮০৪৯০০০ মাইল দূর। ফোব্ আয়তনে খুব ছোট। মাত্র ২২০ কিলোমিটার বা ১৩৭ মাইল লম্বা। এই চাঁদটি আবার অন্য চাঁদদের তুলনায় শনিকে উল্টোদিকে

প্রদক্ষিণ করে। এটির অবস্থান ক্ষেত্রও ভিন্ন। এরজন্য অনেকে মনে করেন ফোব্ আসলে একটি এ্যাস্টিরয়েড। শনির মাধ্যাকর্ষণের জালে ধরা পড়ে গেছে। এখন আর শনিকে প্রদক্ষিণ করা ছাড়া উপায় নেই।

ফোব্ থেকে শনির দিকে এগোলে দেখা মিলবে ইয়াপেটাসের। এটির পৃষ্ঠদেশ কালো কালো আগ্নেয়গিরির গর্তে ভর্তি। এটি শনি থেকে ৩৫৬০৮০০ কিলোমিটার বা ২২১২৬০০ মাইল দূরে। ইয়াপেটাস আর টাইটানের মাঝে রয়েছে হাইপারিয়ন। এটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই চাঁদটি গোল নয়, লম্বা মতন। এটি লম্বায় ৪১০ কিলোমিটার বা ২৬০ মাইল, আর চওড়ায় ২৬০ কিলোমিটার বা ১৬০ মাইল। হাইপারিয়নের গায়ে এককালে যে প্রচণ্ড উল্কাপাত হয়েছিল—তা এর বড় বড় কালো কালো গর্ত দেখলেই বোঝা যায়। এর থেকে এও বোঝা যায় যে চাঁদটি আমাদের চাঁদের মতই মৃত। পরিবর্তন ঘটানোর মতো আগুন বা উত্তাপ এর ভেতর আর নেই। টাইটান পার হয়ে শনির দিকে এগোলে দেখা পাবে রিয়ার। এটি শনি থেকে ৫২৭১০০ কিলোমিটার বা ৩২৭৫০০ মাইল দূরে। এটির পিঠও গর্তে ভর্তি। একসময় অগ্ন্যুৎ-পাতের ফলে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন তা-জমাট-বরফে ঢাকা।

রিয়ার পর হচ্ছে ডিয়ন। এটিও বরফে ঢাকা তবে এখানে বিরাট লম্বা উপত্যকা রয়েছে। ডিয়নের গায়ে জ্যোতির্বিদরা একটা মস্তবড় গোল সাদা দাগ আবিষ্কার করেছেন। এর নাম দিয়েছেন এ্যামাটা (Amata)। পণ্ডিতদের ধারণা আগ্নেয়গিরির একটা বিরাট গর্ত বরফে ভর্তি হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা সাদা গোল দাগ। ডিয়ন আয়তনে ১১২০ কিলোমিটার বা ৬৯৬ মাইল লম্বা।

ডিয়নের থেকে অল্প ছোট হচ্ছে টেথিস্ (Tethys)। এটির বিস্তার হচ্ছে ১০৬০ কিলোমিটার বা ৬৬০ মাইল। এখানে দুটি উল্লেখ-যোগ্য জিনিস আছে। একটি হচ্ছে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বা ২৫০ মাইল বিস্তৃত এক আগ্নেয়গিরির মুখ। চাঁদ হিসেবে টেথিস জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অনেক আগেই হয়তো এই আগ্নেয়গিরির গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্য উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হলো—একটা মস্ত বড় ফাটল।

চাঁদটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে এই ফাটলটি রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে টেথিসের প্রায় সবটাই বরফে তৈরী। এই জমাট বরফ ফেটে গিয়ে এই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।

শনির কাছাকাছি গ্রহ তিনটি হচ্ছে জানুস, মাইমাস আর এনসিল্যাডাস। জানুস অবশ্য এখন ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। ভাঙা দাঁতের দুটি টুকরোর মতো—দুটিই শনিকে পরিক্রমা করছে।

মাইমাস খুব বড় নয়। এর বিস্তার ৩৯২ কিলোমিটার বা ২৪০ মাইল। এখানেও একটি বিরাট গর্ত রয়েছে। মাইমাস শনি থেকে ১৮৫৫৪০ কিলোমিটার বা ১১৫৩০০ মাইল দূর।

এনসিল্যাডাস শনি থেকে ২৩৮০৪০ কিলোমিটার বা ১৪৭৯০০ মাইল দূরে। এই উপগ্রহটি ৫০০ কিলোমিটার বা ৩০০ মাইল চওড়া। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পৃষ্ঠদেশে এখনও পরিবর্তন ঘটছে।

আমাদের সৌরজগতে শনি তার অসংখ্য উপগ্রহ নিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মনে রেখো খালি চোখেই এই গ্রহটিকে দেখা সম্ভব। রাতের আকাশে তাই নজর রাখতে ভুলোনা।

॥ ১০ ॥ দূরের গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো

বহুকাল পর্যন্ত পণ্ডিতরা সৌরজগতের মাত্র পাঁচটি গ্রহের সন্ধান জানতেন। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি। পৃথিবীকে ধরলে ছটি। শনি পেরিয়েও যে গ্রহ থাকতে পারে একথা জ্যোতির্বিদদের মনে উদয় হলেও, প্রমাণ করতে পারেন নি।

১৭৮১ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হারশেল (William Herschel) সর্বপ্রথম শনির পর আর একটি নতুন গ্রহকে লক্ষ্য করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এটি একটি ধূমকেতু। কিন্তু কয়েকমাস ধরে গবেষণা চালানোর পর হারশেল ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা স্থির করলেন, না, এটি ধূমকেতু নয়, এটি আরেকটি গ্রহ।

হারশেল সে সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জ ছিলেন তাঁর বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। হারশেল কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ রাজা তৃতীয় জর্জের নামে গ্রহটির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো গ্রহটির নাম দেওয়া হবে ইউরেনাস। প্রাচীন রোমান পুরাকাহিনী অনুসারে ইউরেনাস হচ্ছে শনি বা সার্টানের পিতা আর বৃহস্পতি বা জুপিটারের পিতামহ।

ইউরেনাস আবিষ্কৃত হবার প্রায় ৬৫ বছর বাদে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের পেছনে দুই গণিতজ্ঞের বিশেষ অবদান রয়েছে।

ইউরেনাস আবিষ্কৃত হবার বছর দশেকের মধ্যে পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নীতি অনুযায়ী গ্রহটির যে পথে সূর্য পরিক্রমা করার কথা ছিল, ইউরেনাস ঠিক সে পথে ঘুরছে না। তাঁরা অনুমান করেন অন্য কোনো অজানা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব সম্ভবত ইউরেনাসের গতিপথের এই ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছে। এরপর ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গণিতজ্ঞ, জন অ্যাডামস্ অঙ্ক কষে নতুন অজানা গ্রহটির অবস্থান স্থির করেন। আর ঠিক ঐ একই সময়ে Urbain Le Verrier নামে এক ফরাসী গণিতজ্ঞ অঙ্ক কষে নেপচুনের অবস্থান খুঁজে বার করেন। জন এ্যাডামসের ভাগ্য খারাপ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু বার্লিন মানমন্দিরের পণ্ডিতরা ফরাসী গণিতজ্ঞের অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন গ্রহটির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে স্থির করেন। ১৮৪৬ সালে ইউহান গ্যালে (Johaun Gaille) নামে এক জ্যোতির্বিদ চোখে টেলিস্কোপ দিয়ে সর্বপ্রথম গ্রহটিকে দেখেন। সমুদ্র-দেবতা নেপচুনের নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হয় নেপচুন।

কিন্তু নেপচুনই শেষ নয়। ১৯৩০ সালে ঐ একইভাবে জ্যোতির্বিদরা প্লুটোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পণ্ডিতরা ইউরেনাস আর নেপচুনের গতিপথ যেভাবে ছঁকে দিয়েছিলেন, দেখা গেল গ্রহ দুটি সেভাবে ঘুরছে না।

মার্কিন জ্যোতির্বিদ স্যার পারসিভাল লাওয়েল এই দেখে বললেন,

তাহলে এর পেছনে অন্য কোনো গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারসাজি রয়েছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্যার পারসিভাল লাওয়েল গ্রহটির অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমেরিকার এ্যারিজোনাতে যে মানমন্দির আছে—সেখানে ক্লাইভ টমবা বলে এক বৈজ্ঞানিকের ওপর এই অজানা গ্রহটিকে খুঁজে বার করার ভার পড়ে। তিনি এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা অনেক অনুসন্ধান করে, দূরবীনে তোলা অনেক ছবি বিশ্লেষণ করে ১৯৩০ সালে প্লুটোর অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন। সৌরজগতের নবম গ্রহ বৈজ্ঞানিকদের তালিকায় স্থান পায়। প্রাচীন রোমান দেবতা প্লুটোর নামানুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হয় প্লুটো। তবে অনেকের ধারণা স্যার পারসিভাল লাওয়েলের নামের আদ্যক্ষর দুটি নিয়ে গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে প্লুটো।

সৌরজগতে বৃহস্পতি আর শনির মতো ইউরেনাস ও নেপচুনও অতিকায় গ্রহ। দুটিই পৃথিবী থেকে আয়তনে প্রায় চারগুণ বড়।

ইউরেনাস

ইউরেনাস সূর্যের সপ্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৮৬৭০০০০০০ কিলোমিটার বা ১৭৮০০০০০০০ মাইল। এত দূরে বলে টেলিস্কোপ দিয়েও ইউরেনাসকে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হয় ইউরেনাসের আকাশ মেঘে ঢাকা। এই মেঘ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর মিথেইন গ্যাসে তৈরী। মিথেইন গ্যাসের জন্য দূর থেকে ইউরেনাসকে একটি সবুজ তারার মতো দেখায়। জ্যোতির্বিদরা মনে করেন, ইউরেনাসের অভ্যন্তরে, কেন্দ্রস্থলটি হয়তো ধাতু আর পাথরে তৈরী। তাকে ঘিরে আছে বরফ, তরল হাইড্রোজেন আর হাইড্রোজেন গ্যাসের আস্তরণ।

হালে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দৌলতে ইউরেনাস সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসাতে, জ্যোতির্বিদরা এক উড়োজাহাজের মানমন্দির থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পান শনিগ্রহের মতো ইউরেনাসেরও

বলয় রয়েছে। এই উড়োজাহাজের মানমন্দিরটির নাম Kuiper Air-borne Observatory। এরপর ১৯৮৬ সালে মহাকাশ অনুসন্ধানী যন্ত্র ভয়েজার-দুই ইউরেনাসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছু ছবি পাঠিয়েছিল। তাতে—সংখ্যায় নয়টি বলয়ের সন্ধান মিলেছে।

বলয় ছাড়া ইউরেনাসের পাঁচটি চাঁদও আছে। এই পাঁচটি চাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে মিরাণ্ডা, এরিয়েল, আমব্রিল, টাইটানিয়া আর ওবেরন। শেকস্‌পীয়ারের লেখা মিডসামার নাইট'স্ ড্রিম নামে নাটিকাতে এই নামগুলির সন্ধান পাবে। এখন পর্যন্ত এই চাঁদগুলি সম্পর্কে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ইউরেনাসের ব্যস হচ্ছে ৫১৮০০ কিলোমিটার বা ৩২২০০ মাইল। সূর্য থেকে বহুদূরে বলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এই গ্রহটির প্রায় ৮৪ বছর সময় লাগে। তবে নিজের চারদিকে গ্রহটি মাত্র ১৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে; অর্থাৎ ইউরেনাসের একদিন আমাদের আধখানা দিনের সামান্য বেশী সময়।

নেপচুন

আগেই বলেছি ইউরেনাসের মত নেপচুনও একটি অতিকায় গ্রহ। এটিকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব। টেলিস্কোপ দিয়েও স্পষ্ট দেখা যায় না। সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব ৪৪৮৬০০০০০০ কিলোমিটার বা ২৭৯০০০০০০০ মাইল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন সূর্যকে ঘুরে আসতে নেপচুনের প্রায় ১৬৪ বছর সময় লাগে। তবে নিজের চারদিকে ঘুরতে ১৮ ঘণ্টার সামান্য বেশী সময় নেয়। গ্রহটি পৃথিবীর থেকে আয়তনে প্রায় চারগুণ বড়। এর ব্যাস হচ্ছে ৪৯৫০০ কিলোমিটার বা ৩০৮০০ মাইল। নেপচুনের চারদিকে এক বায়ুমণ্ডল রয়েছে। জ্যোতির্বিদরা মনে করেন এই বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন, মিথেইন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। এই বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর হালকা গ্যাসে আর নীচের স্তর ঘন গ্যাসে তৈরী। তার নীচে আছে তরল হাইড্রোজেন

গ্যাসের স্তর আর তার নীচে বরফ। পণ্ডিতরা অনুমান করেন একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে লোহা ও পাথর।

নেপচুনের দুটি চাঁদ। একটির নাম দেওয়া হয়েছে নেরিড (Nereid) আরেকটির নাম ট্রাইটন (Triton)। ট্রাইটন খুব কাছে আর নেরিড্ অনেকখানি দূরে। নেপচুনেরও বলয় আছে।

প্লুটো

সৌরজগতের দূরতম গ্রহ প্লুটো সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। তবে আয়তনে গ্রহটি অত্যন্ত ছোট। পণ্ডিতরা অনুমান করেন এর ব্যস ২২০০ কিলোমিটার বা ১৩৭৫ মাইল মতন। সূর্য থেকে গ্রহটি বহু দূরে। তবে প্লুটোর সূর্য পরিক্রমার পথ ডিম্বাকৃতি বলে কখনো কখনো গ্রহটি সূর্যের কাছে যায় ; তখন গ্রহটি নেপচুনের থেকেও সূর্যের কাছে সরে যায়। সে সময় সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব হচ্ছে ৪৪২৪০০০০০০ কিলোমিটার বা ২৭৪৩৫০০০০০ মাইল। আবার যখন দূরে সরে যায় তখন সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব হচ্ছে ৭৩৭৫০০০০০০ কিলোমিটার বা ৪৫৭২৫০০০০০ মাইল। প্লুটোর স্থান সৌরজগতের একেবারে একপ্রান্তে। সূর্যকে ঘুরে আসতে গ্রহটির লাগে ২৪৮ বছর আর নিজের চারদিকে ঘুরতে সময় নেয় ৬ দিন ৯ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। সূর্য থেকে বহু দূরে বলে সূর্যের আলো প্লুটোর গায়ে খুব একটা পৌঁছায় না। প্লুটোর পিঠে দাঁড়িয়ে যদি সূর্য দেখার চেষ্টা কর তাহলে দেখবে সূর্য যেন দূর আকাশের একটি মিট্‌মিটে তারা। সূর্যের যে উত্তাপ আমরা পৃথিবীতে পাই। তার একহাজার দুশো ভাগের একভাগ প্লুটোতে গিয়ে পৌঁছায়। তাহলে ভেবে দেখো ওখানে কি বেদম ঠাণ্ডা।

প্লুটো আয়তনে ছোট বলে অনেক জ্যোতির্বিদের ধারণা, এটি আসলে গ্রহ নয়। হয়তো নেপচুনের একটি চাঁদ। নেপচুনের চাঁদ ট্রাইটনের সাথে সুদূর অতীতকালে হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল ;

তার ফলে প্লুটো নেপচুনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে ছিঁটকে বেরিয়ে গেছে। অনেক জ্যোতির্বিদের ধারণা নেপচুন পেরিয়ে হয়তো কিছু গ্রহাণুপুঞ্জও আছে। প্লুটো তাদেরই একটি। এ্যাস্টিরয়েড বা গ্রহাণুদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের গতিপথ ডিম্বাকৃতি। প্লুটোরও তাই। তবে পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। প্রথমত প্লুটো আয়তনে সৌরজগতের সবচাইতে বড় এ্যাস্টিরয়েড সিরাসের থেকে আয়তনে আড়াইগুণ বড়, আর হালে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে যে প্লুটোর চারপাশে প্রাকৃতিক গ্যাসের আবরণ রয়েছে। এ্যাস্টিরয়েড হলে এটা সম্ভব হতো না।

তবে এ্যাস্টিরয়েডই হোক আর পুরোপুরি গ্রহই হোক, জ্যোতির্বিদদের ধারণা সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের মত প্লুটোও ৫০০০০০০০০০ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। পণ্ডিতদের ধারণা প্লুটোর কেন্দ্রস্থল কঠিন পাথরে তৈরী আর পৃষ্ঠদেশ জমানো মিথেইন গ্যাসের বরফে ঢাকা। এই বরফের ওপর সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়।

ছোট্ট গ্রহ হলে কি হবে, প্লুটোর একটি চাঁদ আছে। খানিকটা আকস্মিকভাবে এই চাঁদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। মাত্র সেদিন—১৯৭৮ সালে জেমস্ ক্রিস্টি নামে এক জ্যোতির্বিদ দেখেন। তিনি প্লুটোর যে সব ছবি তুলেছেন, তাতে প্লুটোর পিঠের কাছে ঢিবি মতন একটা কি দেখা যাচ্ছে। পরে বোঝা গেল এটি একটা উপগ্রহ। এর নাম দেওয়া হলো শ্যারন (Charon)। এই উপগ্রহটি প্লুটো থেকে মাত্র ১৯৪০০ কিলোমিটার বা ১২০২৪ মাইল দূরে আর এটির ব্যাস হচ্ছে ১২০০ কিলোমিটারের মতন। প্লুটোকে ঘুরে আসতে এটি ছয় দিন নয় ঘণ্টা সময় নেয়। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, নিজের চারদিকে ঘুরতে প্লুটোর ঠিক ঐ একই সময় লাগে। ফলে প্লুটোর একপাশ থেকে চাঁদটিকে সব সময় একই স্থানে দেখা যায়, অন্য পাশ থেকে কোন সময়ই দেখা যায় না। অর্থাৎ একদিকে যেমন চিরকালের পূর্ণিমার চাঁদ—অন্যদিকে তেমনি চিরকালের ঘোর অমাবস্যা।

১৯৭২ সালে মহাকাশযান পাইওনীয়ার-১০ পৃথিবী ছেড়ে বৃহস্পতির

উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে এটি প্লুটো যে পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে তার কাছাকাছি পৌঁছায়। দুঃখের কথা সে সময় প্লুটো কাছে ছিল না বলে এই দূরতম গ্রহটি সম্পর্কে আমরা কোন খবর জোগাড় করতে পারিনি। পাইওনীয়ার-১০ এখন সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশের সীমাহীন জগতে পাড়ি দিয়েছে। আমাদের কাছে এই মহাকাশযানটি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

তোমাদের আগেই বলেছি ইউরেনাস আর নেপচুনের যে পথে ঘোরা উচিৎ ছিল তা ঘুরছে না দেখে পণ্ডিতদের মনে সন্দেহ জাগে, আর তাঁদের অনুসন্ধানের দৌলতে প্লুটোর হদিশ মেলে। কিন্তু এখন পণ্ডিতরা মনে করছেন প্লুটো এতো ছোট যে এই গ্রহটির প্রভাবে ইউরেনাস বা নেপচুনের মত অতিকায় গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ পথে বিঘ্ন ঘটার কথা নয়। তবে কি আরো একটি গ্রহ আছে ? দশম গ্রহ ? জ্যোতির্বিদরা এই দশম গ্রহের সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দেন নি। তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনাবিষ্কৃত গ্রহটিকে তাঁরা অচিহ্নিত গ্রহ বা Planet × নামে অভিহিত করেছেন। বলা যায় না, হয়তো একদিন মহাকাশযান রোবটযন্ত্রগুলির দৌলতে সূর্যের দশম গ্রহ আবিষ্কার হবে। ততদিন পর্যন্ত নয়টি গ্রহ নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

॥ ১১ ॥ সৌরজগতের আগন্তুক

হঠাৎ সেদিন অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে বেশ ধূমধাম করে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের সৌরজগতে সূর্যের কাছাকাছি দিয়ে ঘুরে গেল। সে সময়ে সারা পৃথিবীতে জ্যোতির্বিদদের কি উৎসাহ! তাঁরা যে শুধু চোখে দূরবীন লাগিয়েই বসেছিলেন তা নয়, মহাকাশে রোবট যন্ত্র পাঠিয়ে ধূমকেতুটির ছবি তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। দেশে বিদেশে সবাই টেলিভিসন খুলে হাপিত্যেশ করে বসেছিল—পাছে ঐ মুহূর্তটি ফসকে যায়!

শুধু হ্যালির ধূমকেতুই নয়—সৌরজগতের বাইরে যে সীমাহীন মহাকাশ রয়েছে সেখান থেকে প্রায়ই এটা ওটা সেটা—আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে। হ্যালির ধূমকেতু ছাড়াও আরো অজস্র ধূমকেতু বা Comet আমাদের সূর্যের কাছাকাছি দিয়ে ঘুরে যায়।

তবে হ্যালির ধূমকেতু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে প্রায় ৭৬ বছর বাদে বাদে এই ধূমকেতুটির আবির্ভাব ঘটে। পৃথিবীর নানা-স্থান থেকে তখন খালি চোখেই ধূমকেতুটিকে দেখা যায়। মায়ের মুখে শুনেছি ১৯১০ সালে কলকাতায় ছাদে দাঁড়িয়ে দিগন্তে ধূমকেতুটির ঝাঁটার মত ল্যাজ দেখা যেত।

১৯৮৬ সালে যাদের বয়েস ছিল ১০, ২০৬২ সালে ৮৬ বছর বয়সে তারা আবার ধূমকেতুটিকে দেখতে পাবে।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ধূমকেতু লক্ষ্য করে এসেছে। তবে ধূমকেতু যে কি জিনিশ তারা জানতো না। ইয়োরোপে প্রাচীন গ্রন্থে হ্যালির ধূমকেতুর নানা ছবি দেখা যায়। ১০৬৬ সালে বৃটেনে হেস্টিংসের যুদ্ধে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার জয়লাভ করার পর শিল্পীরা তার যে ছবি এঁকেছিলেন সে ছবির পটভূমিতে হ্যালির ধূমকেতুর ছবি রয়েছে। ১৩০১ সালে ইটালীর জিওট্টো (Giotto) নামে একশিল্পী হ্যালির ধূমকেতুর ছবি এঁকে তার নাম দেন বেৎলেহেমের তারা (The Star of Bethlehem)। ১৯৮৬ সালে বৈজ্ঞানিকরা যে রোবটযন্ত্রটি মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন, ইটালীর ঐ শিল্পীর নামে তার নাম দিয়েছিলেন জিওট্টো। জিওট্টো খুব কাছের থেকে হ্যালির ধূমকেতুর ছবি পাঠিয়েছিল। তবে ধূমকেতুটির একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশের কালে জিওট্টো ছবি পাঠানো বন্ধ করে। বৈজ্ঞানিকরা আগের থেকে আশঙ্কা করেছিলেন ধূমকেতুটির অন্দরে যে অজস্র ধূলোবালি পাথরের টুকরো রয়েছে তাতে রোবট-যন্ত্রটির হঠাৎ আঘাত লেগে অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। জিওট্টো ছবি পাঠানো বন্ধ করায় ওরকম একটা কিছু ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

হ্যালির ধূমকেতুটির নামকরণ হয়েছিল বিখ্যাত জ্যোতিবিদ এডমণ্ড

হ্যালির নামে। ১৬৮২ সালে যখন ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে উদয় হয় তখন ইংল্যাণ্ডের এই জ্যোতির্বিদ অঙ্ক কষে সর্বপ্রথম বলে দেন প্রায় ৭৬ বছর বাদে ধূমকেতুটিকে আবার দেখা যাবে। হ্যালির কথা অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। ১৭৫৮ সালে লোকে ধূমকেতুটিকে আবার দেখতে পেয়েছিল। হ্যালি নিজে অবশ্য ধূমকেতুটি দেখার জন্য অতদিন বেঁচে থাকেন নি।

আমাদের সৌরজগতে অবশ্য হ্যালির ধূমকেতু ছাড়াও আরো অসংখ্য ধূমকেতু আসা যাওয়া করে। গ্রহ উপগ্রহের মত তারাও সৌরজগতের অন্তর্গত। কিন্তু তাদের সূর্য পরিক্রমার পথ সৌরজগতের বাইরে দূরতম গ্রহ প্লুটোকে ছাড়িয়েও বহুদূর বিস্তৃত রয়েছে।

ধূমকেতুগুলির পরিক্রমা পথ গোল নয়। এগুলি elliptical বা ডিম্বাকৃতি। ফলে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় যেমন এরা সূর্যের কাছে এসে পড়ে অন্য সময় তেমনি আবার বহুদূরে চলে যায়। সূর্য পরিক্রমা করতে ধূমকেতুদের কয়েকবছর থেকে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে। হ্যালির ধূমকেতু বেশ তাড়াতাড়িই—৭৬ বছর মতন বাদে বাদে সূর্যের কাছে চলে আসে। তবে এমন ধূমকেতুও আছে যারা বেশ কয়েক হাজার বছর বাদে বাদে সূর্যের কাছে এসে পড়ে। সৌরজগতের সীমানার মধ্যেও বেশ কিছু ধূমকেতু আছে! তাদের সূর্য প্রদক্ষিণকাল তত বেশী নয়।

এত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধূমকেতুরা সৌরজগতে আনাগোনা করছে যে চট্ করে বলা কঠিন হঠাৎ কখন একটা নতুন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হবে। তবে মানুষের কাছে নতুন হলেও সেটা হয়তো আদৌ নতুন নয়। হয়তো বহু বছর আগে সেটি একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে গেছে। আমরা তার খোঁজ পাইনি। কিম্বা পৃথিবীতে সে সময় হয়তো মানুষের আবির্ভাবই হয়নি।

ধূমকেতু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো খুব বেশী নয়। নভোচারীরা একে dirty snowball বা নোংরা তুষারপিণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। ধূম-কেতুর নিজের কোনো উত্তাপ নেই, এগুলি সত্যি সত্যিই বিষম ঠাণ্ডা

বরফের মতোই। এদের ভেতরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেইন, এ্যামোনিয়া আর জলীয় বাষ্প জমানো অবস্থায় আছে। ধূমকেতুর একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে পাথর আর ধাতুকণা। এই অংশটিকে বলা হয় নিউক্লিয়াস (Nucleus)। নিউক্লিয়াসের বাইরে আছে ধূলো আর হাল্কা গ্যাসের এক আবরণ। এর নাম কোমা (Coma)।

ধূমকেতুর নিজস্ব কোনো আলো নেই। কোমার ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় বলে একে উজ্জ্বল দেখায়। সাধারণত ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থলটি ২ থেকে ১০ কিলোমিটার বা ৭-৮ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তার বাইরে কোমার উজ্জ্বল আবরণটি প্রায় একলাখ কিলোমিটার বা ৬০-৭০ হাজার মাইল ছড়িয়ে থাকে। ধূমকেতু সূর্যের দিকে যত এগোয়, সূর্যের উত্তাপ আর সৌরবায়ুর আঘাতে ততই তার জমানো আবরণটি গলতে থাকে। এর ফলে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তা বিরাট পুচ্ছের মতো ধূমকেতুর পেছনে ছড়িয়ে পড়ে। এই পুচ্ছ কয়েক কোটী কিলোমিটার বা মাইল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। এই পুচ্ছ এতই স্বচ্ছ যে এর ভেতর দিয়ে তারা পর্যন্ত দেখা যায়। ধূমকেতু সূর্যের দিকে যত এগোয় এই পুচ্ছ আয়তনে তত বাড়তে থাকে। সূর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ধূমকেতু যেমন দূরে যেতে থাকে তার কোমা আর নিউ-ক্লিয়াস আবার জমতে শুরু করে। ফলে পেছনের পুচ্ছও তেমনি কমতে কমতে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনেক ধূমকেতুর আবার ছুটি পুচ্ছ দেখা যায়। একটি গ্যাসের অন্যটি ধূলোর। ধূমকেতু আয়তনে খুব একটা বড় নয় বলে সূর্যের উত্তাপে এর জমানো গ্যাস গলে পেছনে পুচ্ছের সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ধূমকেতু চোখে দেখা যায় না।

অনেকে মনে করেন সৌরজগতের সৃষ্টির সময় সূর্য গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির পরও যে সব ছিঁটে ফোটা গ্যাসীয় উপাদান অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ধূমকেতু তৈরী। ধূমকেতুর গাঠনিক উপাদান বিশ্লেষণ করলে সৃষ্টির গোড়াতে সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ কি অবস্থায় ছিল তার হয়তো খানিকটা হদিশ মিলবে।

অতীতে যখন ধূমকেতু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কম ছিল তখন অনেকেই একে শুভ বা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতেন। তবে ধূমকেতু শুভও নয় অশুভও নয়, সৌরজগতের আরেকটি আশ্চর্য বস্তু মাত্র।

ধূমকেতুর মত সৌরজগতের আরেকটি আশ্চর্য বস্তু হচ্ছে উল্কা। রাত্রিবেলা তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে হয়তো দেখবে এখানে ওখানে যেন একটি তারা হঠাৎ খসে পড়লো। অনেক সময় দেখতে পেলে একসাথে যেন অনেক আলোর ফুলঝুরি জ্বলে উঠলো। এগুলি চোখের ভুল নয়। একেই বলে উল্কা। জ্যোতির্বিদরা ইংরেজিতে একে তিন নামে আখ্যা দিয়েছেন—Meteor, Meteorite, Meteoroid। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে যখন থাকে তখন তাকে বলে Meteoroid। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে এগুলি অনেক সময় জ্বলে পুড়ে গিয়ে আলোর ফুলঝুরি সৃষ্টি করে। তাকে বলে Meteor বা উল্কা। ইংরেজিতে এদের অনেক সময় Shooling Star ও বলা হয়। Meteor বা উল্কা যদি না জ্বলে গিয়ে ধপাধপ্ মাটিতে এসে পড়ে তখন তাকে বলে Metiorite—উল্কাপাত।

উল্কা হচ্ছে পাথর বা ধাতুর টুকরো ওজনে সাধারণত এক আউন্স থেকে পাঁচ ছয় পাউণ্ড বা দুই তিন কিলোগ্রামের মত। এদের বেশীর ভাগই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সাথে সাথে জ্বলে যায়। ভূপৃষ্ঠে খুব একটা এসে পৌছায় না। তবে বড় ধরনের উল্কাপাত যে ঘটেনি তা নয়। তোমাদের আগেই বলেছি আমেরিকায় এ্যারিজোনাতে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে বিরাট এক উল্কাপাতের ফলে যে গর্ত হয়েছিল লোকে আজও তা দেখতে যায়। এই গর্তটির আয়তন ৩৯০০ ফুট চওড়া আর ৬০০ ফুট গভীর।

সৃষ্টির গোড়ার দিকে পৃথিবীর পিঠে হুমদাম বহু উল্কাপাত হয়েছিল। কিন্তু আজ নদী, বন্যা, হিমবাহ আর বৃষ্টি তার বহু চিহ্ন ধুয়ে মুছে দিয়েছে। সমুদ্রে তলিয়ে গেছে অনেক বড় বড় গর্ত। তবে বড় ধরনের উল্কাপাত না হলেও ছোটখাটো উল্কাপাত পৃথিবীর পিঠে এখনও হচ্ছে। ১৯০৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইবেরিয়া অঞ্চলে এক বিরাট

বিস্ফোরণ হয়। কাছাকাছি গাছপালা সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এই বিস্ফোরণের কম্পন পৃথিবীর নানাস্থান থেকে অনুভূত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন ওখানে একটি ৩৭০০ টন ওজনের উল্কাপাতও হয়েছিল। ওখানে এ্যারিজোনার উল্কাপাতের মত বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি না হলেও যে ছাই আর পাথরের টুকরো পাওয়া গেছে তাই বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতেও প্রায় ৬০ টন ওজনের এক উল্কাপাত হয়েছিল। যে বিরাট ধাতু ও পাথরের খণ্ডটি মাটিতে এসে পড়েছিল এটি এখনো সেখানেই আছে। কলকাতার যাদুঘরের ভূবিজ্ঞান অংশটিতে গেলে হয়তো ছোটখাটো অনেক উল্কাখণ্ড দেখতে পাবে। পৃথিবীর নানা দেশের যাদুঘরেই এ ধরনের সংগ্রহ আছে।

পৃথিবী থেকে বছরে বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন অংশে উল্কাপাত দেখা যায়। মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রেক্ষিতে এই উল্কাপাত ঘটে। কতগুলি বিশেষ তারিখে সবচাইতে বেশী উল্কাপাত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই তারিখগুলিতে টেলিস্কোপ হাতে রাতের আকাশের দিকে হাপিত্যেশ করে চেয়ে থাকেন। সেই তারিখগুলি হচ্ছে ২৩শে এপ্রিল, ১২ই আগস্ট, ২১শে অক্টোবর, ১৬ই নভেম্বর আর ১৩ই ডিসেম্বর।

এই তারিখগুলিতে যদি খেয়াল করে রাতের আকাশে নজর রাখো তাহলে খালি চোখেই হয়তো উল্কাপাত দেখতে পাবে। বিশেষ করে ২১শে অক্টোবর আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রেক্ষিতে উল্কাপাত হয়। কালপুরুষ বা Orion কে সহজেই চেনা যায়।

জ্যোতির্বিদদের কাছে উল্কাখণ্ডগুলির মূল্য অনেক। এখন মানুষ চাঁদে গিয়ে মাটিপাথর সংগ্রহ করে এনেছে। মঙ্গলে রোবটযন্ত্র পাঠিয়ে তার মাটিও বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু কিছুকাল আগেও পর্যন্ত মহাকাশে কি ধরনের পদার্থ, গ্যাস বা ধাতু রয়েছে—তা একমাত্র উল্কাখণ্ড বিশ্লেষণ করেই জানা সম্ভব ছিল। উল্কাখণ্ডের মধ্যে নানাধরনের ধাতব উপাদান পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণমেরু অঞ্চলে এমন সব উল্কাখণ্ড

পাওয়া গেছে যার ভেতর এ্যামিনো এসিড রয়েছে। এ্যামিনো এসিড জীবজগতের একটি অন্যতম উপাদান—এ না হলে প্রাণের সৃষ্টি অসম্ভব হতো। এ কারনেই অনেকে মনে করেন—শুধু পৃথিবীতেই নয়—হয়তো মহাকাশেও প্রাণীর জন্মের উপাদানগুলি গ্যাস অবস্থায় রয়েছে।

উল্কাপাত যে শুধু পৃথিবীতেই ঘটে তা নয়। সূর্যের নয়টি গ্রহ আর তাদের উপগ্রহগুলির ওপর সৃষ্টির গোড়ার দিকে কোটি কোটি বছর আগে প্রচণ্ড উল্কাপাত হয়েছিল এবং এখনো হচ্ছে। এই উল্কাপাতের ফলেই বুধ আর চাঁদের চেহারা অমন ক্ষতবিক্ষত দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতির উপগ্রহ ক্যালিস্টোর ওপর এত উল্কাপাত হয়েছে এবং হচ্ছে যে উপ-গ্রহটির ভূপৃষ্ঠ বলে আর কিছু নেই। সবই গর্তে ভরা।

ভয়েজার-১ আর ২-এর কল্যাণে এধরনের অনেক খবরই আমরা আজ জানতে পেরেছি। ভবিষ্যতে আরো নতুন ধরনের, আরো উন্নত ধরনের মহাকাশ অনুসন্ধানী রোবটযন্ত্র তৈরী হবে। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে সেগুলি আমাদের খবর পাঠাবে, টেলিভিশন ক্যামেরায় ছবি তুলে পাঠাবে। তখন মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরো বেড়ে যাবে। বিশেষ করে সৌরজগৎ সম্পর্কে।

তবে ইতিমধ্যেই আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে দেখতে পাচ্ছি সৌরজগতে আমাদের পৃথিবী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রহটি যে শুধুমাত্র আমাদের জন্মভূমি আমাদের বাসস্থান তাই-ই নয়। সৌরজগতে হয়তো একমাত্র এই গ্রহটিতেই প্রাণের বিকাশ হয়েছে আর তার ফলে এত বড় মানবসভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশে দূরতম নক্ষত্রমণ্ডলীতে অন্য কোন সূর্যের অন্য কোন গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। তবে যতদূর আমরা জানি—সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। কাজেই এই পৃথিবীকে রক্ষণাবেক্ষণ এই প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার কঠিন দায়ীত্ব তোমাদের আজকের দিনের কিশোর-কিশোরীদের। মাত্র ৪০-৫৫ বছর আগে তোমাদের বাবা মা ঠাকুর্দা-ঠাকুমাদের আমলে মানুষ

পরস্পরের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ করে, আনবিক বোমা ব্যবহার করে প্রায় গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। সে ভুল যেন আর না ঘটে। মহাকাশের অগুনতি গ্রহ নক্ষত্রে যদি কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তাদের কাছে আমাদের একটি মাত্রই পরিচয় আমরা কালো নই, সাদা নই, আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই—আমরা পৃথিবীর মানুষ, আর আমাদের তারার নাম সূর্য ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

Asteroids—গ্রহাণুপুঞ্জ। সৌরজগতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এদের অবস্থান। এগুলি ছোটবড় পাথরের টুকরো। সংখ্যায় প্রায় ৩০০০। সব চাইতে বড় খণ্ডটির নাম সেরাস। গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র ভেস্টা নামে পাথরখণ্ডটিকেই পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা সম্ভব। ইটালির জ্যোতির্বিদ জুসেপ্পে পিয়াৎসে ১৮০১ সালে গ্রহাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

Astronaut—নভোচারী। নভোচারীদের মধ্যে রুশ এবং মার্কিনীরাই সংখ্যায় বেশী। নভোচারীদের মধ্যে নীল আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম চাঁদে পদক্ষেপ করেছিলেন।

Astronomy—জ্যোতির্বিদ্যা বা মহাকাশবিজ্ঞান। পুরাকাল থেকেই মানুষ গ্রহতারা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছে। মানুষের গবেষণা, ধ্যান-ধারণা এবং আবিষ্কৃত তথ্য এই বিজ্ঞানে সংরক্ষিত।

Astronomer—জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা মহাকাশ বিজ্ঞানী। এদের অনেক সময় জ্যোতির্বিদ বলা হয়। এদের সাথে Astrologer বা হস্তরেখা-বিদ / গণকদের কোন সম্পর্ক নেই।

Atmosphere—বায়ুমণ্ডল। আমাদের গ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। আমাদের প্রাণধারণের জন্য এই বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডল আমাদের রক্ষা করে। অন্য কয়েকটি গ্রহ এবং উপগ্রহের চারপাশে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তবে তা প্রাণধারণের পক্ষে উপযুক্ত কিনা প্রমাণিত হয়নি।

Aurora—মেরুজ্যোতি। সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক গ্যাস বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর আকাশে বিচিত্র আলোর সৃষ্টি করে। উত্তর

এবং দক্ষিণ মেরুতেই এই আলো বিশেষ করে দেখা যায়। তাই একে বলে Aurora Borealis বা উত্তর মেরুজ্যোতি এবং Aurora Australis বা দক্ষিণ মেরুজ্যোতি। অন্য কয়েকটি গ্রহের আকাশেও মেরুজ্যোতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

Axis—অক্ষরেখা। পৃথিবীর উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত একটি সরলরেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই কাল্পনিক রেখাটিকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে। সূর্যের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর অক্ষরেখা ২৩°৫ ডিগ্রী হেলানো। এর জন্যই পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। অন্য গ্রহগুলিরও অক্ষরেখা কল্পনা করা হয়েছে। তারাও নিজেদের অক্ষরেখা কেন্দ্র করে ঘোরে।

Big Bang Theory—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি নিয়ে যে মতবাদগুলি চালু আছে Big Bang Theory তাদের মধ্যে একটি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় ২০০০০০০০০০০ বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু পদার্থ একত্রে অত্যন্ত গরম এবং ঘনীভূত অবস্থায় ছিল। এই আগুনের গোলাটির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই আজকের গ্রহ নক্ষত্র সূর্য তারার সৃষ্টি।

Cayons—পাহাড়ের খাদ। পৃথিবীতে আমেরিকায় Grand Canyon এইরকম একটি গভীর খাদ। কিন্তু মঙ্গল গ্রহের গভীর খাদের তুলনায় তা কিছুই না। মঙ্গলের খাদ স্থানে স্থানে ৫ কিলোমিটার বা ৩ মাইল গভীর আর ২৪০ কিলোমিটার বা ১৫০ মাইল চওড়া।

Chromosphere—সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডলের একটি অংশ। পৃথিবী থেকে সূর্যের যে আলোকময় অংশটি দেখা যায় তা হাল্কা জ্বলন্ত গ্যাসের একটি স্তর। এই স্তরের বাইরের অংশটির নাম Chromosphere। এটি কয়েক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত।

Clouds—মেঘ। আমাদের পৃথিবীর আকাশে মেঘ আছে যেমন আরো কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহের আকাশেও মেঘ আছে। তবে এদের গ্যাসীয় উপাদান ভিন্ন।

Coma—ধূমকেতুর কেন্দ্রের চারপাশে ধূলো আর হাল্কা গ্যাসের যে

আবরণ রয়েছে তার নাম কোমা।

Comet—ধূমকেতু। হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছর মতন ব্যবধানে সৌর-জগতে সূর্যকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে যায়।

Constellation—তারামণ্ডল প্রাচীনকাল থেকে মানুষ আকাশের নক্ষত্র-গুলির এক একটা চেহারা কল্পনা করে তার নাম দিয়েছে। যেমন সপ্তর্ষি (Great Bear) অথবা কালপুরুষ (Orion) I এগুলিকেই বলা হয় তারামণ্ডল বা Constellation।

Continental drift—পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসমুদ্রগুলি যে বিরাট শিলাস্তরের ওপর অবস্থিত তা পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পাথরের স্রোতে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এতে পৃথিবীর চেহারা ক্রমাগত পালটে যাচ্ছে। জার্মান ভূতত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড ভেগ্‌নার সর্বপ্রথম এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

Core—সূর্যের বা পৃথিবীর কেন্দ্র। তবে যে কোন বস্তুর কেন্দ্রকেও Core বলা যেতে পারে। যেমন আপেলের কেন্দ্র Applecore।

Corona—সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডলের একেবারে বাইরের অংশটাকে Corona বলা হয়। সূর্যের এই অংশটি মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল বা কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়া আছে। এটি অত্যন্ত হাল্কা গ্যাসে তৈরী। Corona-র পরের অংশটিকে বলা হয় Chromosphere।

Crater—আগ্নেয়গিরির মুখ। মঙ্গল শুক্র বুধ এবং চাঁদে এ ধরনের প্রচুর গর্ত আছে বলে দূর থেকে কালো কালো দেখায়।

Crust—পৃথিবীর মাটির নীচের ঠাণ্ডা পাথরের স্তর। এটি হাল্কা পাথরে তৈরী এবং স্থানে স্থানে ৩৫ কিলোমিটার বা ২২ মাইল মতন গভীর।

Density—ঘনত্ব। শনিগ্রহ পৃথিবী থেকে ওজনে বহুগুণ ভারী হলেও এখানে বস্তুর ঘনত্ব খুবই কম।

Earth—পৃথিবী। সূর্যের তৃতীয় গ্রহ। একমাত্র এই গ্রহটিতেই প্রাণের বিবর্তন ঘটেছে।

Earth Quake—ভূমিকম্প। অন্য গ্রহ উপগ্রহেও ভূমিকম্প হয়। চাঁদে

হয় চাঁদকম্প বা Moon quake।

Eclipse—গ্রহণ। অন্য গ্রহেও সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্ভব।

Electric Particle—বিদ্যুৎকমা। সূর্য রশ্মি থেকে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎকণা মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করেও তা অনেক সময় প্রবেশ করে।

Elliptical Orbit—ডিম্বাকৃতি কক্ষপথ। ধূমকেতু এবং গ্রহগুলি ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমা করে। কখনো তারা সূর্যের কাছে যায় কখনো দূরে সরে যায়।

Evening Star—সন্ধ্যাতারা। সূর্য অস্ত যাবার অল্প পরে দিগন্তে শুক্রগ্রহকে দেখা যায়। তাকেই বলি সন্ধ্যা তারা।

Fuel—জ্বালানী। মহাকাশ যাত্রায় রকেটগুলি তরল হাইড্রোজেন বা তরল অক্সিজেন জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। পারমানবিক শক্তি ব্যবহার করে রকেট পাঠানো যায় কিনা—এই নিয়ে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করছেন।

Gagarin—১৯৬১ সালে রূশ নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহাকাশ যাত্রা করেন। মহাকাশে ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট কাটিয়ে তিনি নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

Galaxy—নক্ষত্রমণ্ডল। কোটি কোটি সূর্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূলোবালি, গ্যাস, ধূমকেতু ইত্যাদি নিয়ে এক একটি Galaxy বা নক্ষত্রমণ্ডল তৈরী। সৌরজগৎ যে নক্ষত্র মণ্ডলীতে রয়েছে তার নাম ছায়াপথ বা Milky Way। পণ্ডিতরা অনুমান করেন প্রায় ১২০০০০০০০০০ বছর আগে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসের থেকে আমাদের ছায়াপথের সৃষ্টি হয়। এতজোরে ছায়াপথ ঘুরছে যে এর চেহারাটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত দাগকাটা। এরই ভেতর অজস্র নক্ষত্রের সাথে আমাদের তারা সূর্যও রয়েছে। সেই সাথে আমরাও আছি।

Galilean Moon—ইটালীর জ্যোর্তিবিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি সর্বপ্রথম বৃহস্পতির সবচাইতে বড় চারটি উপগ্রহকে আবিষ্কার করেন।

এর জন্য এই চারটি উপগ্রহকে গ্যালিলিওর চাঁদ বলে অভিহিত করা হয়। এগুলি হচ্ছে আইও, ইয়োরোপা, গালিমিড্ আর ক্যাসিস্টো।

Gravity—মাধ্যাকর্ষণ। যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কে কতটা আকর্ষণ করবে তা বস্তুর ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। গ্রহ নক্ষত্রের মত বিরাটাকায় বস্তুর আকর্ষণের জোরও প্রচণ্ড বেশী। এ কারণেই সূর্যের আকর্ষণে গ্রহ উপগ্রহ স্থিরভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে, ছিঁটকে বার হয়ে যায়নি। আমাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে আমরাও মাটিতে পা রেখে চলছি ছিঁটকে আকাশে উড়ে যাইনি। সব গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ ছোটবড় বস্তুর মধ্যে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে। বৃটেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটনই সর্বপ্রথম এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

Halley's Comet—ধূমকেতুরা যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে যায়—একথা বিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ এডমণ্ড হ্যালি সর্বপ্রথম অঙ্ক কষে বলে দেন। সে সময় যে ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে দেখা গিয়েছিল হ্যালির নামে তার নামকরণ হয়। প্রতি ৭৬ বছর মতন বাদে বাদে এই ধূমকেতুটি সূর্য ও দক্ষিণের পথে পৃথিবীর আকাশে একবার করে উদয় হয়।

Ionosphere—ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৭০ কিলোমিটার বা ৪০ মাইল উর্ধে যে বায়ুমণ্ডল তাকেই Ionosphere বলা হয়। এখানের বিদ্যুৎকণার মারফৎ পৃথিবীর বহু দূর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেতার সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয়। সূর্যের উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুৎকণা এখানেই বায়ু-মণ্ডলের সাথে ধাক্কা খেয়ে মেরুজ্যোতি বা অরোরা বোরিত্রলিসের বিচিত্র আলোর সৃষ্টি করে।

Jupiter—বৃহস্পতি। সূর্যের পঞ্চম এবং সর্ববৃহৎ গ্রহ।

Jupiter's eye—বৃহস্পতির রক্তচক্ষু নামে সাধারণভাবে বৃহস্পতির গায়ের যে দাগটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিচিত আসলে তা প্রচণ্ড

একটি ঝড়ের আলোড়ন। গত তিনশো বছর ধরে বৃহস্পতির পিঠে এই ঝড় বইছে।

Kuiper Airborne Observatory—আমেরিকায় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার কাছে উড়োজাহাজে এক মানমন্দির রয়েছে। এখান থেকেই ইউরেনাসেরও যে বলয় আছে—সেকথা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন।

Launch—উৎক্ষেপণ। মহাকাশযানগুলি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

Lava—আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত গলানো পাথর। চাঁদে লাভার সমুদ্র আছে। এককালে তা নিশ্চয়ই টগবগ করে ফুটতো। এখন জমে নীরেট পাথর হয়ে গেছে।

Light year—আলোকবর্ষ। এক বছরে আলোর গতি কতটা তার ওপর ভিত্তি করে আলোকবর্ষ স্থির হয়। মহাকাশে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে সমস্ত দূরত্বই আলোকবর্ষের হিসেবে মাপা হয়। মহাকাশে আলোর গতি প্রতি মুহূর্তে ২৯৯৮০০ কিলোমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল। এই হিসেবে সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের সব চাইতে কাছের তারা হচ্ছে Proxima Centauri। সেখানে যেতে প্রায় ৪·৩ আলোক-বর্ষ সময় লাগবে।

Luxmi—শুক্রগ্রহের একটি সমতল এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মী।

Magnetic force—চুম্বক শক্তি। গ্রহগুলির চারপাশে একটি চুম্বক-শক্তির ক্ষেত্র রয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবী আর শনির চুম্বকশক্তির ক্ষেত্র খুবই শক্তিশালী।

Mars—মঙ্গল গ্রহ। সূর্যের চতুর্থ গ্রহ।

Maxwell Montes—শুক্রের সবচাইতে উঁচু পাহাড়।

Marcury—বুধগ্রহ। সূর্যের প্রথম গ্রহ।

Meteorite—উল্কাপাত।

Milky Way—ছায়াপথ। ছায়াপথ আমাদের Galaxy বা নক্ষত্রমণ্ডলী। এটি Spiral Galaxy অর্থাৎ খানিকটা চাকতির মতো দেখতে।

আমরা একেবারে একপাশে আছি।

Moon—চাঁদ। উপগ্রহ। পৃথিবীর একটি চাঁদ। বৃহস্পতি এবং শনির বহু চাঁদ।

Morning Star—শুকতারা। সূর্য ওঠার অল্প আগে দিগন্তে শুক্রগ্রহকে দেখতে পাওয়া যায়। তাকেই বলে ভোরের তারা বা শুকতারা।

Nebulae—নীহারিকা মণ্ডলী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাকাশে গ্যাস আর বস্তুকণার এক অতিকায় ঘূর্ণায়মান মেঘের থেকে নক্ষত্রের জন্ম হয়। এই মেঘকেই নেবুলা বলা হয়।

Nuclear Fusion—পারমাণবিক প্রক্রিয়া। সূর্যের কেন্দ্রে এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড তেজ ও শক্তির উৎপন্ন হচ্ছে।

Neptune—নেপচুন। সূর্যের অষ্টম গ্রহ।

Orbit—এই উপগ্রহের সূর্য পরিক্রমা পথ।

Outer Space—সৌরজগতের বাইরের মহাকাশ।

Pangaea—বিশকোটি বছর খানেক আগে পৃথিবীতে শুধু একটি বিরাট ভূস্থল বা মহাদেশ ছিল। পণ্ডিতরা তার নাম দিয়েছেন প্যাঙ্গিয়া। পরে এটি ভেঙে বর্তমান মহাদেশগুলির সৃষ্টি হয়!

Planet—গ্রহ। সৌরজগতের নয়টি গ্রহ। মহাকাশে সূর্যের মত অন্য নক্ষত্রগুলির গ্রহ উপগ্রহ থাকা আশ্চর্যের নয়।

Pluto—প্লুটো। সূর্যের নবম এবং দূরতম গ্রহ।

Radioactive—তেজস্ক্রিয়। অণুপরমাণুর পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে তেজস্ক্রিয় শক্তির উৎপত্তি হয়। সূর্য থেকে তেজস্ক্রিয় শক্তি মহাকাশে সব সময়ই ছড়িয়ে পড়ছে।

Ring—বলয়। সূর্যের অতিকায় চারটি গ্রহ—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের বলয় আছে। বলয়গুলি ধূলোবালি ও পাথরের টুকরোয় তৈরী। গ্রহের চারপাশে বিপুল বেগে ঘুরছে বলে দূর থেকে এদের বলয়ের মত দেখায়।

Rocket—রকেট। মহাকাশে যাত্রী ও সরঞ্জাম পাঠানোর কাজে রকেট ব্যবহার করা হয়।

Saturn—শনিগ্রহ। সূর্যের ষষ্ঠ গ্রহ। শনির বলয় অত্যন্ত উজ্জ্বল।

Sattelite—আগে এর অর্থ ছিল উপগ্রহ। কিন্তু বর্তমানে মানুষ আকাশে যে সব কৃত্রিম রকেট বা নভোযান পাঠিয়ে নানা ধরনের কাজ চালাচ্ছে—সেগুলিকেই Sattelite বলে। এগুলি পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের মতন ঘোরে আর আবহাওয়ার সংবাদ, বেতারবার্তা টেলিভিসনের ছবি পাঠাতে সাহায্য করে।

Solar System—সৌরজগত। সূর্য, নয়টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ। ধূমকেতু ও গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে সৌরজগত গঠিত।

Solar Wind...সৌরবায়ু। সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত গ্যাস বিরাট বেগে মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

Space—মহাকাশ।

Space probe—মহাকাশ তত্ত্ব অনুসন্ধানী রোবটযন্ত্র।

Star—তারা বা নক্ষত্র। সূর্য একটি তারা।

Sun—সূর্য। সূর্য আমাদের তারা।

Sun Spot—সূর্য কলঙ্ক। সূর্যের পৃষ্ঠদেশে এক একস্থানে উত্তাপের পরিমাণ পাশের জায়গা থেকে কম হওয়াতে সে স্থানগুলিকে টেলিস্কোপে কালো কালো দেখায়।

Telescope—দূরবীক্ষণ। টেলিস্কোপের সাহায্যে বহুদূরের জিনিষ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। জ্যোতির্বিদরা নানাধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন।

Universe—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

Uranus—ইউরেনাস। সূর্যের সপ্তম গ্রহ।

Venus—শুক্রগ্রহ। সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ।

'তারার নাম সূর্য' ঝরণা গোরলের প্রথম বই হলেও তিনি নতুম লেখিকা নন। পাঁচের এবং ছয়ের দশকে ঝরণা সেন নামে তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'অঙ্গনা' 'ইন্দ্রানী' 'পূর্বাশা' 'যুগান্তর' 'শনিবারের চিঠি', শতভিষা পত্রিকায়। 'অস্থায়ী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন তিন দশক আগে।

ঝরণা গোরলে শিক্ষালাভ করেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে পি এইচ ডি করেন। কর্মজীবন শুরু হয় আসানসোল গার্লস কলেজে। লখ্‌নউ বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে বি বি সি বাঙলা বিভাগের প্রযোজিকা হিসাবে কাজ করেছেন। বর্তমানে শিক্ষকতা করেন।

ঝরণা গোরলে লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। 'তারার নাম সূর্য' বিষয়ের গুণে এবং ভাষার আকর্ষণে পাঠকদের ভালো লাগবে বলে আমরা আশা করি।